ছোটোবকুলপুবেব যাত্রী প্রথম সংস্কবণেব প্রচ্ছদচিত্র

ছোটোবকুলপুরের যাত্রী

গাড়িটা ঘণ্টাখানেক লেট করেছে।

ঠিক সময়ে পৌঁছোলেও অবশ্য প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, স্টেশনের তেলের বাতিগুলি তার আগেই জ্বালানো হয়। প্ল্যাটফর্মে অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল, শঙ্কিত ও স্তব্ধভাবে। আরও গভীর রাত্রের ট্রেনের জন্যও এ স্টেশনে সাধারণত আরও অনেক বেশি যাত্রী জড়ো হতে দেখা যায়। আজ একদল সিপাই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর অভাব পূর্ণ করেছে।

গাড়ি দাঁড়ায় মিনিট দেড়েক। এই সময়টুকুর ব্যস্ততা এবং কলরবও আজ স্টেশনে ঝিমানো মনে হয়, তারপর গাড়ি ছেড়ে যাবার দু-চারমিনিটের মধ্যে অদ্ভুতভাবে স্টেশন এলাকা যাত্রীশূন্য হয়ে ঝমঝমিয়ে আসে। গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তারা কোনোদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গেটে টিকিট দিয়ে পথে নেমে যায় - এত লোকে যে টিকিট কাটে এবং সদর গেটে টিকিট দাখিল করে স্টেশন ছাড়ে এও এক অসাধারণ ব্যাপার বটে। চারিদিকে এক নজর তাকালেই টের পাওয়া যায় যে বাড়ির টান আজ সকলের হঠাৎ বেড়ে যায়নি, স্টেশন এলাকা ছেড়ে তফাত হবার তাগিদেই যাত্রীদের এত তাড়া।

পথে নেমেও কেউ দাঁড়ায় না। স্টেশনের লাগাও তেরাস্তার মোড়, দু-তিনটে দোকানে মাত্র আলো জ্বলছে, বাকিগুলিও বন্ধ। চায়ের দোকানের আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাধারণত এ সময় দোকানটা লোকে প্রায় ভরে থাকে, আজ একরকম শূন্য পড়ে আছে। প্রকাণ্ড বাঁধানো বটগাছের তলায় দুজন চাষি কিছু তরিতরকারি সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু ভিন্ডি-বেগুনের দরটা জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যে আজ কারও নেই।

স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক-ওদিক তাকায়। চোখের পলকে তার জানাচেনা স্টেশনটি যে ভাবে যাত্রীশূন্য হয়ে যেতে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মতো ঠেকে তার কাছে। একদল সশস্ত্র সিপাইয়ের দখলে স্টেশনের চেহারা যে অভিনব হয়েছে এটা তার খাপছাড়া লাগে না। এ দৃশ্য দেখা অভ্যাস আছে। কাল এখানে যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার বিবরণও সে গাড়িতে শুনেছে। এ রকম দৃশ্যই সে প্রত্যাশা করছিল।

দেখলি ব্যাপার ?

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, দেখব আবার কী ? হাঙ্গামা হয়েছে, পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার হবে ? হারার মতো দাঁড়িয়ে থেকোনি, যাই চলো।

বিড়ি সিগারেট টানতে টানতে ক জন বাবুমতো লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাস্থিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ করছিল, নামধামও জিজ্ঞাসা করছিল দু-একজনকে। স্টেশন যাত্রী-শূন্য হয়ে আসায় এতক্ষণে দিবাকরদের দিকে তাদের নজর পড়ে। মাঝবয়সি বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, চাষাভুসো বাজে লোক, যেতে দাও। তার খদ্দর-পরা ছোকরা বয়সি সঙ্গীটি পান-রাঙা মুখে আরও দুটো পান পুরে চিবুতে চিবুতে আন্নার দিকে চেয়ে থাকে, আচমকা প্যাঁচ করে পিক ফেলে হাত উঁচিয়ে আঙুল ঠেরে দিবাকরকে কাছে ডাকে, এই ! শোনো !

দিবাকর অবশ্য দেখেও দ্যাখে না, শুনেও শোনে না। পুঁটুলিটা বগলে চেপে দড়িবাঁধা হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকে।

ওরা জন তিনেক তখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

টিকিট আছে ?

আছে।

শার্টের বুক পকেট থেকে দিবাকর দুখানা টিকিট বার করে দেখায়।

কোথা যাবে ?

আজ্ঞে ছোটোবকুলপুর যাব।

শুনে তারা যেন একটু চমকে যায়। পানখোর ছোকরা আবার প্যাঁচ করে খানিকটা পিক ফেলে। গতকালের হাঙ্গামায় প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে খানিক রক্তপাত ঘটেছিল, ছোঁড়া যেন পানের পিক দিয়েই তার জের টেনে প্ল্যাটফর্মটা রাঙা করে দিতে চায়। দিবাকরও পান ভালোবাসে, রাস্তায় পুরো চার পয়সার তৈরি পান কিনেছে। কাগজের ঠোঙাটা বার করে সেও একটা পান মুখে পুরে দেয়। লোকগুলির এত কাছে দাঁড়ানোর জন্যই বোধ হয় পানটা তার একটু তিতো লাগে। ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানাটার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলোটা তার চোখে পড়ছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শো-মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধাচাষি আধামজুর প্রাণটা বড়োই বিগড়ে আছে।

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞাসা করে, রাত করে ছোটোবকুলপুর যাবে ? সেখানকার খবর জানো সব ?

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে বলে, খবর জেনেই এয়েছি বাবু। আত্মীয়কুটুম আছে সেথা, খপর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েছে।

বেঁটে বলে, ও বাবা তোমার দেখি চটাং চটাং কথা !

না বাবু, গরিব মানুষ কথা কোথা পাব ?

তেমাথার পাশে দুটি খোলা গোরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কাছে মাটিতে শুয়ে জাবর কাটছে একজোড়া শীর্ণ ও শান্ত বলদ। স্টেশনের সামনে সাধারণত দু-তিনটি ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোড়া যত প্রাচীন, গাড়িগুলি ততোধিক। বেগার খাটার ভয়ে গরিব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়িই বার করেনি। গাড়ি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবার মতো বড়োলোক দিবাকর কোনোদিন ছিল না, আজ কিন্তু সে ঘোড়ার গাড়ি চেপেই যেত—আন্নার রুপার গয়না বাঁধা দিয়ে এই উদ্দেশ্যেই সে টাকা জোগাড় করে এনেছে। ছোটোবকুলপুর পৌঁছোতে রাত হবে এটা জেনেই তারা রওনা দিয়েছে, তবে রাত করে মেয়েছেলে আর শিশু নিয়ে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে ঘোড়ার গাড়ির আশাটা ছিল।

এখন ভরসা গোরুর গাড়ি।

গাড়োয়ান কই হে ! দিবাকর ডাকে।

দুই গাড়ির দুজন মালিকেরই আবির্ভাব ঘটে। আবছা আলোয় মনে হয় একজন যেন পুরানো বটগাছটা এবং অন্যজন দোকান ঘরের বেড়া ভেদ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের তাড়া নেই, গোরুর গাড়িতে কম্পিটিশনও নেই। ধীরেসুস্থে তারা জানতে চায় দিবাকরেরা কোথায় যাবে।

ছোটোবকুলপুর।

শুনে তারা দুজনেই ঘাড় নাড়ে। ওরে বাবা, রাত্রিবেলা ছোটোবকুলপুর কে যাবে ! সেখানে সৈন্যপুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমতো লড়াই চলছে'

চারজনেই তারা সম্মুখে পথটার দিকে তাকায়। ছোটোবকুলপুরের এ রাস্তা কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে, কিন্তু সে পর্যন্ত এখন নজর চলে না—মনে হয় বিপজ্জনক অন্ধকারেই বুঝি পথটা হারিয়ে

গেছে। বাঁ হাতে কোলের বাচ্চাকে সামলে ডান হাতে আন্না দিবাকরকে এক পা পিছু ঠেলে দেয়, নিজে এগিয়ে দায়িত্ব নেয়।

ওখান তক্ নাই বা গেলে বাবা ? যদ্দুর যেতে চাও নিয়ে চলো, বাকি রাস্তা মোরা হেঁটে যাব। ভাড়া ঠিকমতো পাবে।

রাম বলে, রাতের বেলা কে অত হাঙ্গামা করে, না কী বলো ঘোষের পো ?

ওমা, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ ! আন্না মিষ্টি সুরে বলে, বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাব, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ !.

রাম চুপ করে থাকে। তার বয়স বেশি, সাহস কম। গগন ঘোষ বলে, কমলতলা তক যেতে পারি।

তাই হোক। কমলতলার সীমা পেরিয়েও যদি নামিয়ে দেয় তবু প্রায় আধমাইল হাঁটতে হবে। পুরো দেড়ক্রোশ হাঁটার চেয়ে সে অনেক ভালো। একটা গাড়িতে বলদ জুড়লে আন্না উঠে বসে, এ কসরত তার অভ্যাস আছে। গগনের গাড়িটা নড়বড়ে, ক্রমাগত লেজ মলে তাড়া না দিলে শীর্ণ বুড়ো বলদ এক পা এগোতে চায় না। আন্না আগ্রহের সঙ্গে ছোটোবকুলপুরের খবর জিজ্ঞাসা করে, তবে গাঁয়ে ঘরে পৌঁছোবার আগে বাপ-ভাইয়ের কুশল জানার আশা সে করে না। গ্রামের সাধারণ অবস্থার ঘনিষ্ঠতর বিবরণ, অনেক নতুন খবর গগনের কাছে জানা যায়। দূর থেকে তারা শুনেছিল যে ছোটোবকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রচণ্ড আঘাতে গাঁয়ের গেরস্থ জীবন তছনছ চুরমার হয়ে গেছে। গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপার তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তারপর গাঁয়ের লোক এমন আঁটসাঁট বেঁধে তৈরি হয়ে জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষেদের কোনো লোক অন্তত দু ডজন সৈন্য ছাড়া গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই সাহস পায় না।

একবার মুখ খুললে গগনকে থামানো যায়। গোরুর লেজ মলে মলে মুখে গোরু তাড়ানোর অদ্ভুত আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সে চারিদিকের অবস্থা বর্ণনা করে যায়, তার মতে কলিযুগ সত্যই এবার শেষ হতে চলেছে। সমস্ত লক্ষণ থেকে তাই মনে হয়। নইলে রাজায় প্রজায় এমন যুদ্ধ বাধে ?

মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলেপুলেরা ফের সত্যযুগ করবে !

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথে বেশ শোরগোল তুলেই গাড়ি চলে। রাস্তার ধারের কোনো কোনো ঘরের বেদখল দাওয়া থেকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো এসে পড়ে গাড়িতে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন আসে : কে যায় ? কোথা যাবে ?

গগন জবাব দেয় : ইস্টেশনের ট্রেইনের মেয়েছেলে। কমলতলি যাবে।

গাড়ি গাছপালা বাড়িঘরের আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত টর্চের আলো আন্নার গায়ে সাঁটা থাকে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিরীহ নির্দোষ মেয়েছেলেই যে যাচ্ছে গাড়িটাতে সেটা যেন যতক্ষণ সম্ভব প্রত্যক্ষ করা চাই।

এ অঞ্চলে ঘন বসতি, গায়ে গায়ে লাগানো বড়ো বড়ো গ্রাম তবু এখন সন্ধ্যারাত্রেই রাস্তায় প্রায় লোক চলাচল নেই। গেঁয়ো লোকের পথ চলাও খাপছাড়া রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এই পথ ধরেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকে পাড়ি দেয়, আজ যেন চারিদিকে সকলেরই দীর্ঘ পথ হাঁটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তার পাশ থেকে আচমকা হয়তো একজন রাস্তায় উঠে আসে, জোরে জোরে পা ফেলে খানিকটা এগোতে না এগোতেই আবার রাস্তার ধারের অন্ধকারেই মিশিয়ে যায়। মাত্র দুটি একটি লোকের এ রকম টুকটাক খুচখাচ খুচরো চলাফেরার প্রয়োজন নির্জনতা ও স্তব্ধতাকে আরও বেশি অস্বাভাবিক করে তোলে।

কলতলায় মস্ত ছাউনি পড়েছে। চোখ তুলে সেদিকে চেয়ে গগন মাথা চুলকায়।

যাব নাকি এগিয়ে ছোটোবকুলপুর তক ?—গগন অনুমতি চাওয়ার সুরে বলে, দিবাকরেরাই যেন তাকে যেতে বারণ করেছে ?—চলো যাই মেয়া, তোমায় নিয়ে যাই। মাঝ রাস্তায় কেমন করে নামিয়ে দি বলো, আঁ ?

আন্না খুশি হয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, ভগবান মুখপোড়া একচোখো কানা, নইলে তোমার নতুন গাড়ি হত বাবা, জোয়ান বলদ হত !

ছোটোবকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতে ছুঁতে একেবারে তিন তিনটে টর্চের আলো গোরুর গাড়িতে এসে পড়ে। কিছু হাঁকডাক শোনা যায়। বেশ বোঝা যায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখে যারা পাহারা দিতে গেড়ে বসেছে বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, অসময়ে গগনের গোরুর গাড়ির আবির্ভাবে তাদের মধ্যে খানিকটা সানন্দ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। গাড়িতে শুধু দুটি বলদ, একটি গাড়োয়ান, একজন পুরুষ ও একটি মেয়েমানুষ এবং একটি বাচ্চা—সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই।

দেখতে দেখতে সাত-আটজন গাড়িটা ঘিরে ফেলে। টুপিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে মাঝ বয়সি মোটা লোকটি, সেই বোধ হয় বেসরকারি দলপতি, গম্ভীর গলায় বলে, কোথা থেকে আসছ ?

গগন বলে, ইস্টিশনের টেরেনগাড়ির প্যাসিঞ্জার আজ্ঞা।

শাট্ আপ ! তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে ? তোমার নাম ?

মোর নাম দিবাকর দাস।

বাপের নাম ? কোথায় থাক ? কী কর ? এদিকে এসেছ কেন ?

বাপের নাম মনোহর দাস। তেনা সগ্‌গে গেছেন—তিপ্পানের মন্বন্তরে। রোগ ব্যারাম কিছু নয়, উপোস দিয়ে মিত্যু। হাওড়ায় থাকি, ঘনশ্যাম-বেটেনট কারখানায় মজুর খাটি। ইদিকে হাঙ্গামা শুনলাম, বউ কাঁদতে লাগল যে তার বাপ ভাই মরেছে না বেঁচে রয়েছে। তা ভাবলাম কী যে কারখানার ধরমঘট দু-দশদিনে মেটার নয়, যা দিনকাল। বউকে নিয়ে দেখে আসি শ্বশুরবাড়ি ব্যাপার কী।

সবিনয়ে স্পষ্ট সরল ভাষায় দিবাকর তাদের আগমনের কারণ ও বিবরণ দাখিল করে। কাঁদাকাটা করে না বলে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে পায়ের তলায় আছড়ে আছড়ে পড়ে না বলে বোধ হয় তার ব্যাখ্যা এদের পছন্দ হয় না।

পুঁটলিতে কী আছে ? বোমা বন্দুক ?

আজ্ঞে কাঁথা কাপড়।

তুমি যে সত্যি দিবাকর দাস, মজুর খাটো, শ্বশুরবাড়ি আসছ, কোনো বদ মতলব নেই, তার প্রমাণ দিতে পার ?

কী প্রমাণ দেব বলেন ? সাক্ষী প্রমাণ তো সাথে আনিনি !

ষোলো সতেরো বছরের স্বেচ্ছাসেবক ফরসা ছেলেটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, দীর্ঘ থলথলে চেহারার প্রৌঢ়বয়সি লোকটির ধমকে বিষম খেয়ে থেমে যায়, কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে।

আন্না বলে, গাঁয়ের চাষাপাড়ার দশটা লোক ডেকে পাঠাও না বাবুরা, মোকে দু-চারজন চিনবেই, গাঁয়ের মেয়া আমি।

সে তো চিনবে, না চিনলেও চিনবে। যাদের সঙ্গে যোগসাজশ তাদের যদি না চিনবে তো কাদের চিনবে ?

আন্না দিবাকরের কানে কানে বলে, গাঁয়ের লোক ডাকতে ডরাচ্ছে, জানো ?

দীর্ঘ থলথলে লোকটি আঙুল উঁচিয়ে বলে, এই ! কানে কানে কী কথা হচ্ছে ? চুপিচুপি শলাপরামর্শ চলবে না, খপর্দার !

গাঁয়ে যাওয়া কি বারণ বাবু ? একশো চুয়াল্লিশ রটিয়েছো ? দিবাকর প্রশ্ন করে।

কদমছাঁটা চুল লম্বাটে মাথা পাঞ্জাবি গায়ে বয়াটে চেহারার ছোঁড়াটা বলে, বারণ কেন, বারণ নেই। তোমরা কে, কী মতলবে এসেছ জানা গেলেই যেতে দেওয়া হবে।

ও সব যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত করো বাবুরা ?

চোপ, তামাশা হচ্ছে, না ?

ধমকানির চোটে দিবাকরেরা চুপ হয়ে যায়, বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠে প্রতিবাদ জানায়। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে ছেলেকে শান্ত করতে করতে আন্না তাদের মন্তব্য ও পরামর্শ শোনে। আচমকা গোরুর গাড়ি চেপে হাজির হয়ে তারা যে গুরুতর ও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে মানুষগুলি রীতিমতো বিব্রত ও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গের জিনিস বেশভূষা চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে সত্যি সত্যি টের পাবার জো নেই যে এরা সত্যিকারের নিরীহ সাধারণ গোবেচারি চাষামজুর মাগভাতার ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ সন্দেহের কারণ। যে তাণ্ডব চলেছে ছোটোবকুলপুরে কদিন ধরে, তাতে সত্যিকারের কোনো ভীরু মুখ্যু ছোটোলোক মাগছেলে সাথে নিয়ে সাধ করে কখনও তার মধ্যে আসতে চায় ? তাও আবার হাঙ্গামার খবর জানবার পরে ! বাজে লোকের এ সাহস হবে কোত্থেকে ? তার চেয়েও বড়ো কথা, সন্দেহের কথা, চারিদিকে এত রাইফেল বন্দুকের সমারোহ দেখেও ওরা মোটে ভড়কে যায়নি, দিব্যি নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব।

একজন নিচু গলায় বলে, নিশ্চয় কোনো ডেঞ্জারাস লোক ছদ্মবেশে এসেছে। আরেকজন বলে, সার্চ করা যাক না ?

দীর্ঘ থলথলে লোকটি হুকুম দেয়, এই ! জিনিসপত্র নিয়ে নামো।

তার মুখের কথা খসতে না খসতে দুজনে দিবাকরকে ধরে টেনে নামিয়ে দেয়। উৎসাহ অথবা উত্তেজনার আতিশয্যে একজনের হাত থেকে পড়ে গিয়ে মুখবাঁধা মাটির হাঁড়িটা ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আধ হাঁড়ি জল আর তাতে কিলবিল করে গোটা ছয়েক শিং মাছ !

দিবাকর গোসা করে বলে, দিলে তো বাবুরা, গরিবের পথ্যির দফা মেরে দিলে তো ? রুগি বউটা এখন খাবে কী !

বলি ওহে দিবাকর দাস, একজন গম্ভীর মুখে বলে, কারখানায় খেটে খাও বললে না ? কুলি মজুরের বউরা কবে থেকে শিং মাছের ঝোল খাচ্ছে হে ? পাঁচ-ছটাকা শিং মাছের সের।

শিঙিমাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু ?

এ ফোড়নের অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে সে গর্জন করে ওঠে, শাট্ আপ, বেয়াদপ !

পোঁটলাটা খুলে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়, তাতে একটা অঘটন ঘটে যায়। আন্নার বাচ্চাটা রাস্তায় দু-একবার পায়খানা করেছে, নোংরা ন্যাকড়া দলা পাকিয়ে আন্না পুঁটলির মধ্যে রেখেছিল। ঘাঁটতে যাওয়ায় অনুসন্ধানীর হাতে ময়লা লেগে যায়। গন্ধে ও স্পর্শে রাগ চড়ে যাওয়ায় বেহিসাবির মতো পুঁটলিটাতে সে বল শুট করার মতো লাথি মেরে বসে। ফলে কাদার মতো তরল পদার্থ খানিকটা তার পায়েও লাগে, ছিটকে বন্দুকের গায়েও একটু আধটু লেগে যায়।

গাড়িতে বিছানো বিচালি তুলে, ছেঁড়া বস্তাটার ভাঁজ খুলে খোঁজার পর গগন আর দিবাকরের গা খোঁজা হয়। দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বার হয় পানের মোড়কটা।

বাঃ, সাজা পান ! দে তো একটা।

তিনটি পান অবশিষ্ট ছিল, তিনজনের মুখে যায়। পান চিবোতে চিবোতে একজন লণ্ঠনের আলোয় পান মোড়া ছাপানো কাগজটার দিকে এক নজর তাকিয়েই যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে চমকে ওঠে। কাগজটা ভালো করে মেলে ধরে সে বিস্ফারিত চোখে বড়ো হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে—'ছোটোবকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি'।

নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, পাওয়া গেছে ! ইস্তাহার পাওয়া গেছে !

ইস্তাহার ? তাই বটে। বিপজ্জনক ইস্তাহার ! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে, তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।

তবু তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আর শূন্যে হাতড়াতে হবে না, মনগড়া সন্দেহ সংশয়ে জর্জরিত হতে হবে না, একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে হাতেব মুঠোয়। এবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে।

এ ইস্তাহার পেলে কোথা ?

প্রশ্নটার যেন স্বাদ আছে এমনিভাবে আরামে জিভে জড়িয়ে জড়িযে উচ্চারণ করা হয়।

ইস্তাহার ? ইস্তাহারের তো কিছু জানি না ! চার পয়সার পান কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।

পানওয়ালা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবে-চিন্তে পান কিনে ইস্তাহাবটাতে জড়িয়ে নিলে ?

কেন ? তা কেন করতে যাব ?

আর ঢং কোরো না। এবার আসল নাম বলো দিকি।

দিবাকর আর আন্না পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

মেজাজ

চা আর ডিম ভাজা এসেছিল দুজনের জন্য, মনোরঞ্জন নিঃশব্দে দুটি প্লেটের ডিম ভাজাই নিজের মুখে পুরে দিতে থাকে। এককালে সে দারুণ কংগ্রেসি ছিল, আজকাল একেবারে চাষাভুসো বনে গেছে। অনেকদিন পরে তাকে দেখে বড়ো আনন্দ হচ্ছিল। ভাষাহীন খিদে দিয়ে এত সহজে সে-ই শুধু চোখের পলকে আত্মীয়তা ঝালিয়ে নিতে পারে। চাষাভুসো বনার কারণও বোধ হয় তাই।

ডিম শেষ করে সে বলে, তোমার তাকানি দেখে ভৈরবকে মনে পড়ছে। সেও এমনিভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে মানুষকে বিব্রত করে।

তোমাকে মোটেই বিব্রত বোধ হচ্ছে না। কিন্তু ভৈরব কে ?

লক্ষ্মীপুরের একজন চাষি। তার মেজাজের অদ্ভুত গল্প শুনলে—

গরিব চাষি ?

দেড়-দুবিঘে জমি হয়তো আছে। তা ছাড়া ভাগে চাষ করে।

গল্পটা বলার আগে তবে একটা সংশয় মিটিয়ে দাও। মানুষটা চাষা, তাতে গরিব, তার মেজাজ হয় কীসে ? জমি নেই, ভাতকাপড় নেই, আরামবিরাম স্বাস্থ্য নেই, দেশের মালিক সরকারের কাছে দূরে থাক গাঁয়ের মালিক জমিদারের বাজার সরকারের কাছে পর্যন্ত মানুষ বলে গণ্য হবার যোগ্যতা নেই, মেজাজের মতো এমন ফ্যাশনেবল দামি চিজ সে কোথা পেল ? কিছু অর্থ সংস্কৃতি আরাম বিলাস প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্থাৎ এককথায় লোকের ওপর ঝাল ঝাড়বার অধিকার না থাকলে তো মেজাজ গজায় না—ওটা খেয়ালখুশির অঙ্গ।

কথাটা বুঝে মনোরঞ্জন মৃদু হাসে।—বেশ, মেজাজ না বলে রাগ বলো, মাথা গরম বলো। যার কিছু নেই তার ঘৃণা রাগ এ সব তো কেউ কাড়তে পারবে না ?

গল্প বলতে মনোরঞ্জন পটু নয়। আমাকেই গল্পটা মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। অভিজ্ঞতার স্বাদটা অবশ্য এসে যায় মনোরঞ্জনেরই।

মাঝারি আকারের মানুষটা ভৈরব, মোটা হাড়, সিঁটকানো শক্ত চেহারা, ছোটো চাপা কপালটার নীচে একজোড়া স্থির জ্বলজ্বলে চোখ। ওই চোখ দিয়ে একদৃষ্টে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা তার স্বভাব। হুকুম শুনতে বা গাল খেতে একটু সময়ের জন্য সামনে এলেও এতে মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বড়োই অস্বস্তি বোধ করে, ভেতরে ভেতরে রেগেও যায় লোকটার ওপরে। প্রথমত সবিনয়েই হয়তো সে দাঁড়িয়েছে রাখালবাবুর সামনে, হাত জোড় করে আজ্ঞে হুজুর বলেই কথা কইছে, কিন্তু মাটিতে আটকে রাখার বদলে চোখ পেতে রেখেছে সোজা রাখালবাবুর মুখে। ধমকধামক গালমন্দ নীরবেই শুনে যাচ্ছে, চিরকাল তার বাপদাদা যেমন শুনে এসেছে, কিন্তু থেকে থেকে আচমকা কী যেন ঝিলিক মেরে যাচ্ছে, ঝলসে উঠছে তার চোখে। দেখলে ভয় করে।

রাখালবাবুর মতো মস্ত লোক, খুশি হলে সে তার গলা কাটতে পারে, সেও একভাবে ভেতরে ভেতরে ভৈরবকে ডরায় !

ভয় তাকে কমবেশি সকলেই করে। তার মেজাজের খবর কারও অজানা নয়, বহুদিন থেকে নানাভাবে পরিচয় পেয়ে আসছে। ঝাঁ করে মাথায় তার রক্ত চড়ে যায় এবং সে অবস্থায় স্বয়ং থানার

দারোগাবাবুকে পর্যন্ত সে যে মেরে বসতে পারে সে প্রমাণও ভৈরব দিয়েছে। গ্রাম্য আক্রোশে একজন তাকে মিথ্যে চুরির দায়ে জড়িয়েছিল, দারোগাবাবু তদন্তে এসেছে। ধমকধামক এবং দু-চারটে চড়চাপড় সে যথারীতি দিব্যি হজম করে যাচ্ছিল, দারোগাবাবু হঠাৎ একটা খারাপ রসিকতা করে বসায় সেটুকু তার সইল না, ধাঁ করে গালে একটা প্রচণ্ড থাবড়া বসিয়ে দিল ! চড়চাপড় যার সইছিল গালমন্দও সইছিল একটা বদ রসিকতায় যে তার মাথা বিগড়ে যাবে, কে এটা ধারণা করতে পারে ? চুরির দায় বাতিল হয়ে গেল কিন্তু জেল তাকে খাটতে হল ওই অপরাধে। বেগুন খেতে গোরু ঢোকার জন্য কানাইয়ের সাথে একদিন তার বচসা, সে ঝগড়া অন্যের মধ্যে খুব বেশি হলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াত—আচমকা লাঠির ঘায়ে সে কানাইয়ের মাথা ফাঁক করে দিল। তাতেও কি রাগ পড়ল ? সেই লাঠি দিয়ে অপরাধী গোরুটার মাথাতেও আরেক ঘা না বসিয়ে পারল না, গোরুটা গেল মরে। এই নিয়ে হল আরেক দফা জেল। এবং একটা সামাজিক হাঙ্গামা।

গো-হত্যার জন্য বিধানমতো প্রায়শ্চিত্ত সে করত, ভট্টাচায্যের কয়েকটা চটাং চটাং কথায় মেজাজ গেল বিগড়ে।

বলল, বামুন আছো, বামুন থাকো, গাল পেড়োনি। করবনি যাও প্রাচিত্তির। কর গে যাও একঘরে। খাটব নরক দশ জন্ম।

কুটুমবন্ধু পাড়াপড়শি তাকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে, তবু সামান্য কারণে আচমকা ধারণাতীতভাবে তবু মাঝে মাঝে বেধে যায়। হেটোরা দোকানিদের সঙ্গে তো তার নিত্য হাতাহাতির উপক্রম ঘটে। মার খেয়ে খেয়ে বাড়ির লোকের প্রাণ যায়। গালমন্দ সে বিশেষ দেয় না, খানিক গালাগালি দিয়ে সামলে যাবার মতো নরম রাগ তার কদাচিৎ হয়। তার গরম হওয়া মানেই একেবারে চরম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া। তার বউ কালীর হয়েছে জ্বর, হয়তো আগের দিন তার পিটুনি খেয়েই। শম্ভুর দোকানে সে বউয়ের জন্য চার পয়সার সাগু কিনতে গেছে।

কম দিয়েছ শম্ভু। ওজন করে দাও।

যাও যাও, বেশি দিয়েছি। চার পয়সার সাগু, তার ওজন চায় !

শুনেই মেজাজে আগুন ধরে যায় ভৈরবের।

কেন হে কত্তা ? চার পয়সা পয়সা নয় ? ওজন করো তুমি, বেশি হয় ফিরে নাও বেশিটা তোমার। তোমার ঠেয়ে ভিক্ষে চাইছি ?

দোকানে তখন ভিড়ের সময়, দু-চারজন ভদ্রলোকও আছে। শম্ভু মুখ বাঁকিয়ে শোলোক বলে, চার পয়সার সাগু খায়, বউ ডিঙিয়ে শাউড়ি পায় !

ভৈরব সাগু ছুঁড়ে মারে শম্ভুর শোলোক-বলা মুখে। তোর সাগু তুই খা।

শুধু সাগু ছুঁড়ে ঠান্ডা হবে তেমন মেজাজ নয় ভৈরবের। এদিক ওদিক তাকাতে সামনে গুড়ের হাঁড়িটা নজরে পড়ে।

গুড় দিয়ে খা !

গুড়ের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে খাবলা খাবলা গুড় সে শম্ভুর মুখে ছুঁড়ে মারে। পরে যা হবার তাই হয়, গরিব অসহায় চাষি তো। কিন্তু সে হিসাব তো আর মেজাজ বোঝে না !

এ সব লোককে নিয়ে ওইখানে বিপদ। রাগ হলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে, নিজের ভালোমন্দের বিচার বিবেচনা পর্যন্ত লোপ পায়, মরবে কী বাঁচবে খেয়াল থাকে না। সুতরাং তুচ্ছতায় যতই সে মশামাছির শামিল হোক, সহজে তাকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। তাই থেকে একটা মোটা সিদ্ধান্ত বোধ হয় করা চলে। যতই মনে হোক যে মেজাজটা তার একেবারেই অন্ধ ও বেহিসেবি, জগৎসংসার ভুলে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় যা খুশি কাণ্ড করে বসে, ঠিক অতটা হয়তো সত্য নয়। মানুষ যে তাকে ভয় করে, সহজে তার পেছনে লাগতে চায় না, এটা বোধ হয় সে বোঝে।

তারপর একদিন এল লক্ষ্মীপুরেব ওই হাঙ্গামা। গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে রাখালের চোরাই ধানচাল চালান বন্ধ করতে যাওয়া নিয়ে যার সূত্রপাত, পরে অবশ্য ব্যাপার অনেকদূর গড়ায়। কারণ, গরিবের যে কোনো বেয়াদবিই ভীতিকর, সমূলে উৎপাটন না করলে চলে না। ধানচাল উপে যেতে যেতে সে এলাকায় মানুষের প্রাণ যায় যায় হলে মরিয়া হয়ে যখন তারা নিজেরাই প্রতিকার করবে স্থির করে, ভৈরবও সেখানে পরামর্শের গোড়ার দিকে উপস্থিত ছিল। ব্যবসায়ী-জমিদার রাখালের অপকর্মের বিবরণ শুনতে শুনতে সে গরম হয়ে উঠেছিল, জোর গলায় দাবি জানিয়েছিল যে, উহুঁ, শুধু ধানচাল নয়, আগে ও লোকটাকে সবাই মিলে ফাঁসি দিতে হবে, তারপর ধানচাল ঠেকানো। বুড়ো বনমালী তাকে ধমক দিয়েছিল, তুই থাম ভৈরব। এ ছেলেখেলা নয়।

তবে যা খুশি করো। মোকে ডেকোনি !

বলে গটগট করে সে উঠে এসেছিল বৈঠক থেকে। তাতে বিশেষ কেউ অখুশি হয়নি। তাকে সঙ্গে রাখার ঝক্কি কম নয়। একা তার জন্যই হয়তো সম্পূর্ণ অকারণে দু-একটা খুনজখম হয়ে যাবে, সে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবে না।

গ্রামের লোককে দাবাতে যে তাণ্ডব শুরু হয তারপর তাবা কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনি। রাখালের গুন্ডাব দল জড়ো হয়ে পাড়ায় পাডায হানা দেয, প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও গ্রামের লোক শেষে প্রাণের দায়ে মরিযা হযে দল বেঁধে তাদেব মেরে হটিযে দেয়। পুলিশের স্থায়ী ছাউনি পড়ে লক্ষ্মীপুরে। করে ৯৮ পাডায গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষাব এমন শক্ত ব্যবস্থা কবে যে রাখালের গুন্ডাবা দল বেঁধেও সেখানে ঢুকতে সাহস পায না।

ভৈববেব ঘরটা ছিল এই এলাকার কিছু তফাতে। একদিন একদল লোক ঘবে ঢুকে খুঁটিব সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধে। বাচ্চা ছেলেটা কালীর কোলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, ছিনিয়ে নিয়ে ভৈববের পিঠের সঙ্গে ছেলেটাকেও তাবা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে। তারপর সেইখানে ভৈববেব চোখেব সামনে কালীর উপব একে একে তাবা সাতজন অত্যাচার করে। আলো জ্বালেনি। জ্যোৎস্না ছিল। গবিবের ছোটো ঘব, খুঁটিটাব তিন-চাবহাত তফাতেই ছেঁড়াকাঁথাব বিছান।

কাহিনির এইখানে থেমে গিয়ে মনোরঞ্জন আচমকা প্রশ্ন করে : কেন বলো তো ? পাশবিক অত্যাচাবের মানে হয়, কিন্তু স্বামীর সামনে কেন ? মাতাল মার্কিন সোলজারদেরও এই ঝোঁক দেখা যেত। কোনো কারণ ভেবে পাই না।

মানে ? অত্যাচাব মানেই বিকাব। অত্যাচাবীর মনে দাবুণ আতঙ্ক থাকে। নিজের বিশ্বাস, নিজের সংস্কার, নিজেব নিযমকানুন পর্যন্ত সে ভাঙছে—নিজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সকলকে পায়ের নীচে পিষে রাখবার জন্য ওরা নিজেরাই নীতি ধর্ম আইন কানুন আদর্শ খাড়া করে—নিজেবাই আবার তা ভাঙে। আত্মবিরোধ এড়িযে যাবার সাধ্য ওদের নেই, অন্যায় করতে ওরা বাধ্য। নেশাখোব যেমন নেশা চড়ায়, এরাও তেমনি অন্যায়কে আরও উগ্র আরও বীভৎস করে চলে। হিটলাব অসংখ্য ভয়াবহ অন্যায় করেছে, যাতে তার এতটুকু স্বার্থসিদ্ধি হয়নি। গুন্ডারা ওই একই জাত।

মনোরঞ্জন একটু ভেবে বলে, তাই কী ? কে জানে !

তারা চলে যাবার পর কালী কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। কাছাকাছি কোনো চালায় আগুন ধরেছে, বাইরে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির রক্তিম দ্যুতিময় রূপ দেখা যায়। ভৈরব মৃদুকণ্ঠে বলে, বাঁধনটা খুলে দে বউ।

তার শান্ত গলার আওয়াজে কালী বোধ হয় আশ্চর্য হয়ে যায়। তবু সে ভয়ে ভয়ে বলে, মোকে কিছু করবে না তো ?

না, তোর কী দোষ ? শিগগির দড়ি খোল—ছেলেটা বুঝি শেষ হয়ে গেল।

কালী তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালে। ছেলের দিকে এক নজর তাকিয়েই এতক্ষণ পরে সে প্রথম আর্তনাদ করে ওঠে। এ পর্যন্ত মাঝে মাঝে শুধু তার গোঙানি শোনা গিয়েছিল। বিক্রি করে কিছু বাড়তি রোজগারের জন্য ঘরে ভৈরব পাটের দড়ি পাকায়, বাঁধবার দড়ির তাদের অভাব হয়নি। দিশেহারা উন্মাদ তারা, ওইটুকু ছেলেকে পাটের সরু পাকানো দড়ি দিয়ে বাপের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধেছে গায়ের জোরে, গলাতেও প্যাঁচ পড়েছে। ইচ্ছা করে কিনা তারাই জানে। ছেলেটা খুব চেঁচাচ্ছিল, কান্না থামাতে হয়তো এইভাবে গলায় দড়ি জড়িয়েছে। দড়ি খুলে নামাতে নামাতেই টের পাওয়া যায় ভৈরবের আশঙ্কাই সত্য, ছেলেটা শেষ হয়ে গেছে।

কালী হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে খুঁটিতে বাঁধা ভৈরব সেই রকম শান্ত গলায় বলে, মোর বাঁধনটা খোল আগে।

ভয়ে ভয়ে কালী তার বাঁধন খুলতে আরম্ভ করে। ভয়টা তার অকারণ নয়, এতদিন একসঙ্গে ঘর করেছে, মানুষটাকে সে সবার চেয়ে ভালোভাবেই জানে। কারণে অকারণে কত ছ্যাঁচা খেয়েছে, গায়ে আজও তার অনেক চিহ্ন আঁকা আছে এখানে ওখানে। এ অবস্থায় আজ ভৈরবের মাথা ঠিক আছে এটা সে স্বপ্নেও সম্ভব বলে ভাবতে পারছিল না। তুচ্ছ কারণে মানুষটা খেপে যায়, মহামারি কাণ্ড বাধিয়ে দেয়, বাইরে রাগের কারণ ঘটলে ঘরে হাতের কাছে তাকে পেয়ে পিটিয়ে দেয়, আজ রাতের এত ভয়ানক কাণ্ড তার সইবে কী করে ? বাঁধন খুলে দিলে দিশেহারা উন্মাদ ভৈরব যদি প্রথমে তাকেই খুন করে বসে !

দড়ি খুলে দিলে যে খুঁটিতে ওকে তারা বেঁধেছিল তাতেই ঠেস দিয়ে ভৈরব মেঝেতে বসে পড়ে। মনে হয়, তার সামনে তার বউয়ের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার হয়ে গেল, তারই গায়ে গায়ে লেগে থেকে কচি ছেলেটা যে ওদের দড়ির ফাঁসে দম আটকে মরে গেল, এ সব কিছুই সে গায়ে মাখেনি। তার রাগও নেই, হা-হুতাশও নেই।

কালী নিজে টের পায় না, সেও কত শান্ত ধীর হয়ে গেছে, ছেলের জন্য উন্মাদিনীর মতো সেও আছড়ে পিছড়ে কাঁদছে না। সাধারণভাবে অসুখে বিসুখে ছেলেটা মরলে এতক্ষণ তার গলা ফাটানো আর্তনাদ সারা গাঁকে জানান দিত তার শোকের খবর। সাতজন অত্যাচার করেছে। স্বামীর সামনে। রক্তাক্ত দেহে রক্তাক্ত মন কি সাধারণ শোক দুঃখের স্তরে থাকতে পারে ?

আবার কে আসে ? ভৈরব অস্ফুট স্বরে বলে।

শুধোও—সাড়া দাও ! কাছে সরে এসে কালী বলে।

কে ?

আমি। বনমালী।

বনমালী ঘরে এসে বলে, আরও ক-জনা আসছে। বন্দুক হাতে পাহারা ছিল, মোরা এগোতে পারিনি ভাই। তোমার ঘরে অত্যাচার করবে তাও মোদের ভাবনার অগোচর ছিল। সেদিন চটাচটির পর তুমি তো তফাতে ছিলে বরাবর !

গরিবের এই দশা।

ভৈরবের নম্র শান্ত সুর বনমালীকেও আশ্চর্য করে দেয়। কোনোদিন কোনো অবস্থাতে কেউ কখনও তাকে এমন ধীরভাবে কথা বলতে শোনেনি। প্রদীপের আলোয় তার দিকে চেয়ে বনমালী ভাবে : পাগল হয়ে যায়নি তো মানুষটা ?

উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে বনমালী বলে, এর প্রতিশোধ পাবে একদিন।

ভৈরব সায় দিয়ে তেমনই ধীরভাবে বলে, পাবে বইকী, শিগগির পাবে।

কড়ায় গন্ডায় শোধ দিতে হবে, সুদে আসলে।

একে একে আরও কয়েকজন চেনা লোক আসে, ভৈরবের ধীর শান্ত ভাব তাদেরও অবাক করে দেয়। নগেনের বউ আর নিতাইয়ের পিসি এসেছিল, এক কোণে তাদের কাছে বসে কালী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুনে ভৈরব বলে, কাঁদিস না বউ। আর কান্না কীসের ? যদ্দিন বেঁচে রইব, তোতে মোতে শুধু দেখব ওদের কত সব্বোনাশ করতে পারি, ক-টাকে কাঁদাতে পারি।

ছেলেকে পুড়িয়ে জিনিসপত্র পুঁটলি করে কালীর সঙ্গে ভৈরব পাড়ার ভিতরের দিকে ব্রজেন দাসের বাড়ির একটা ঘরে আশ্রয় নেয়। একদিকে তাকে দেখে যেমন টের পাওয়া যায় না সে সেই বদরাগি পাগলাটে ভৈরব, অন্যদিকে তেমনই ভাবাও যায় না সেদিন রাত্রে তার জীবনে কী ভীষণ ঘটনা ঘটে গেছে। গ্রামরক্ষী দলে সে নাম দেয়, কাজ করে, মন দিয়ে আলাপ আলোচনা পরামর্শ শোনে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় আর মানুষকে সবলভাবে সংক্ষেপে নিজের কাহিনি বলে। দাওয়ায় বসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাটে বাজারে চাষাভুসো লোককে পরমাত্মীয়ের মতো ঘটনাটা শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করে, প্রতিকার করবে না ? তুমি মোর ভাই ?

সাতদিন পরে সেই গুন্ডার দল যখন মাঝরাত্রে লোচন দাসের ঘরে হানা দিয়ে তাকে আর তার বাপকে বেঁধে বাড়ির বউ আর মেয়েকে নিয়ে আরেকটা উৎসবের আয়োজন করে তখন তিনশো লোক নিয়ে ভৈরব বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, যে কজন এসেছিল প্রায় সকলকেই বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়।

কী ভীষণ যে দেখায় তখন তার মুখের চেহারা। দেখে বনমালী এবং আরও অনেকে বুঝতে পারে ভৈরবের মেজাজ কোথায় চড়েছে। তাই, পরদিন আবার তাকে মৃদু ও শান্ত দেখে তারা কজন আশ্চর্য হয় না।

প্রাণাধিক

আজ জ্যোতির্ময়ের আসবার কথা। দিল্লি থেকে প্লেনে আসছে, লিখেছে অবনীদের বাড়িতে এসে উঠবে এবং দু-একদিন থাকবে। অযাচিত সম্মানিত অতিথি। অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য একজনের কি এরোড্রোমে যাওয়া উচিত নয় ?

এখন সমস্যা হল, কে যাবে ? অবনীর সে বন্ধু, সুতরাং সে গেলেই সবচেয়ে মানানসই হয়, কিন্তু এদিকে মুশকিল হয়েছে যে কেরানি জীবনে অঘটন ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু আপিস গিয়ে কলম পিষে ছুটির পর নিজের ঘর সংসার আত্মীয়বন্ধুর প্রতি প্রাণপণে কর্তব্য করা নিয়ে হিমসিম খেয়ে আর দিন কাটে না। জীবনটাই যাতে টেকে সে জন্য কেরানিপনার রীতিনীতি বিধিব্যবস্থা অর্থাৎ মাসান্তিক মজুরির কিছু উন্নতি সাধনের জন্য বেপরোয়া চেষ্টা শুরু করতে হয়েছে। অবনীদের আপিসে কাল ধর্মঘট—অবনী আবার এটা ঘটাবার ব্যাপারে ভালোরকম জড়িয়ে গেছে। কোনো সম্মানিত বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে নষ্ট করার মতো সময় তার মোটেই নেই।

তার পিসতুতো ভাই সুব্রত যাবে ছাত্রদের জরুরি মিটিংয়ে।

বাণীর সঙ্গেও জ্যোতির্ময়ের একদিন পরিচয় ছিল কিন্তু সে গেলে বাড়িতে এ বেলা রান্না করার লোক থাকবে না, পিসিমার অসুখ।

বাণীর শ্বশুর অবনীর বাবা বুড়ো মানুষ। যত না বুড়ো হয়েছে ভদ্রলোক তার চেয়ে বেশি অকালবার্ধক্য তাকে কাবু করেছে। জেল খেটে খেটে দেশটা স্বাধীন করার পর কোথাও আর পাত্তা না পাওয়ার মনোবেদনার চাপে। বিরাট বিরাট সত্যযুগীয় ফাঁপা স্বপ্ন আর আদর্শগুলিতে সরোজের চিরদিন অন্ধ বিশ্বাস, ভদ্রলোক কোনোদিন ফাঁকিও চেনেনি, ফাঁকি দিয়ে নিজের জন্য বাগাতেও শেখেনি। আদর্শের ব্যাবসাদারি হাটে তাই তার ত্যাগের মহিমা কানাকড়ি দামেও বিকোল না। বাষট্টি বছর বয়সে অম্বলের জ্বালার সঙ্গে প্রাণের জ্বালা মিশে বেচারিকে তাই অথর্ব করে ফেলেছে।

কিন্তু আদর্শ তো তার যাবার নয়। জীবনে কত উন্নতি করেছে জ্যোতির্ময়, কোথায় উঠে গেছে, তার মতো বড়োমানুষকে উপযুক্ত সম্মান না দেখালে গুরুতর অপরাধ হবে। এও তার আদর্শেরই অন্তর্গত। সরোজের তাই টনক নড়ে।

তোমরা বলছো কী ? কেউ যাবে না ? তা কখনো হয় ?

কচি খোকা তো নয়, অবনী বলে, বাড়ি চিনে আসতে পারবে।

ট্যাক্সি চেপে আসবে, অসুবিধাটা কি ?

কতো বড়ো অভদ্রতা হয় ? একটা মান্যগণ্য পদস্থ লোক, তার একটা সম্মান নেই ? তোমরা কেউ না যাও আমি যাব।

তা সরোজের যদি জ্যোতির্ময়কে এগিয়ে আনতে যাবার আগ্রহ জেগে থাকে কারও কিছু বলবার নেই ! নিজের অকারণ নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা ঘুচিয়ে যদি নড়েচড়ে বেড়াতে চায় সেটা বরং ভালো লক্ষণ। শুধু বাণী বলে, আপনি একা যেতে পারবেন না বাবা। মন্টুকে সাথে নিয়ে যান।

মন্টুর বয়স এগারো বছর। সে বাণীর ভাই।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাণী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, ঘামে-ভেজা গায়ে একটু হাওয়া লাগায়। খানিক দূরে রাস্তার ধারে ফাঁকা জমিটুকুতে বস্তির মজুরদের গানবাজনার ছোটোখাটো একটা আসর বসেছে। কী উচ্চগ্রামে ওদের সুর বাঁধা, কী জমজমাট জীবন্ত স্থূল ওদের আওয়াজ। পানের

দোকানটার শেডহীন বালব আর রাস্তার বাতি থেকে ওদের আসরে কিছু আলো পড়েছে, কিন্তু ওরা ধার করা আলোকে পর্যন্ত যেন অগ্রাহ্য করতে নিজেদের এক হাত উঁচু একটা কারবাইডের আলো জ্বালিয়েছে, শিখাটা কাত হয়ে লড়াই করছে বাতাসের সঙ্গে।

আগাগোড়া কী ভাবে বদলে গেছে জগৎ। জ্যোতির্ময় শহরে এসে যেচে তাদের বাড়ি উঠতে চাইবে এই কল্পনাতীত সম্ভাবনায় আগে তারা কত উত্তেজনা বোধ করত, বিব্রত হয়ে উঠত। সন্দেহ নেই যে অনেক কিছু প্রত্যাশাও জাগত তাদের। আজ একমাত্র তার ওই বুড়ো পাগলাটে শ্বশুরটি ছাড়া জ্যোতির্ময়কে নিয়ে কারও বিশেষ মাথাব্যথা নেই। আজ শুধু তারা ধরে নিয়েছে যে, এ একটা রহস্যময় ঘটনা, জ্যোতির্ময় এসে ব্যাখ্যা না করলে এ খাপছাড়া ব্যাপারের মানে বোঝা যাবে না। বালিগঞ্জে তাদের মস্ত বাড়ি সেখানে তার ভাই সপরিবারে বসবাস করছে। শহরে বড়ো বড়ো হোটেলের অভাব নেই, বড়োলোক বন্ধুরও অভাব নেই। তবু জ্যোতির্ময় প্লেন থেকে নেমে সোজা এসে উঠছে তার কেরানিবন্ধুর বাড়ি, অতিথি হয়ে সেই বাড়িতেই দু-একটা দিন কাটাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছে।

শখ ? খেয়াল ? কে জানে কী আছে জ্যোতির্ময়ের মনে ! এ কথা ভেবে নেওয়া বাণীর পক্ষে কঠিন নয় যে তাকে স্মরণ করে তার আকর্ষণে জ্যোতির্ময় আসছে, কিন্তু এ রোমান্টিক কল্পনায় তার সুখ নেই বলে কথাটা ভাবতেও তার ভালো লাগে না। তার জন্যই যদি জ্যোতির্ময়ের এ আগমন হয়, সে জানে তার মানে কী। একদিন চেনা ছিল, হয়তো মাঝে-মধ্যে কখনও মনেও হয়ে থাকতে পারে যে এ মেয়েটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়, দূর থেকে সেই চেতনা মেয়েটিকে ভেবে হৃদয়মনে ব্যাকুলতা জাগায়, জ্যোতির্ময় হঠাৎ তাকে দেখতে আসছে এ কথা কল্পনা করতেও বাণীর হাসি পায়। ঘটনাচক্রে যদি তারই জন্য জ্যোতির্ময় এসে থাকে, তার একমাত্র অর্থ হবে এই যে তার একটা কুৎসিত খেয়াল চেপেছে। মনে পড়েছে যে বাণীকে দু-একবার লোভনীয় মনে হয়েছে অথচ পাবার চেষ্টা করা হয়নি, আজ সে গরিব কেরানির বউ, তাকে দুদিন একটু ঘেঁটে আসা যাক।

আগে থাকতে একটা লোককে মন্দ ভাবতে বাণীর ভালো লাগে না।

কিন্তু জ্যোতির্ময়ের মতো উঁচুস্তরের লোককে মন্দ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাও আজকাল কঠিন। ও জাতটাই বজ্জাত।

সরোজকে জ্যোতির্ময় একটু ঠাহর করে দেখে চিনতে পারে, বলে, ও, আপনি ? আপনার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। অবনী এল না ?

অবনী একটা জরুরি কাজে গেছে। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।

কিছু মনে করার ক্ষীণতম ইচ্ছাটুকুর অস্তিত্বও জ্যোতির্ময় অস্বীকার করে। তাকে বেশ উৎসাহী সানন্দ আত্মপ্রতিষ্ঠ মনে হয়, মন্টুকে চিনতে না পারার ত্রুটির জন্য তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে বলে, ভারী অন্যায় হল। তুমি তো শুধু ওনার ছেলে নও, তুমি যে আবার অবনীরও ইয়ে, না কি বলো অ্যাঁ ?

গাড়িতে সে সরোজকে বলে, আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি। একটা ভুল হয়ে গেল, অবনীকে লিখে দিতে মনে ছিল না, আমি এসেছি যেন চারিদিকে রটিয়ে না বেড়ায়।

না না, এ খবর রটেনি। ওই যে তুমি লিখেছিলে কাজের চেয়ে দুটো দিন বন্ধুর বাড়ি শান্তিতে বিশ্রামের লোভটা তোমার বেশি, ওটা পড়েই অবনী কাউকে জানায়নি। জানলে দশটা লোক এসে তোমায় বিরক্ত করবে এ কি আমরা জানি না বাবা ? তুমি এ গরিবের বাড়ি পা দেবে, লোকের এটা ধারণায়ও আসবে না।

একটা সিগারেট বার করে সরোজের প্রায় সাদাটে চুল ও শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সেটা না ধরিয়েই জ্যোতির্ময় আবার পকেটে রেখে দেয়। তাতে আনন্দের সীমা থাকে না সরোজের।

জ্যোতির্ময় বলে, আপনাকে খুলেই বলি। আমি একটা এজেন্সি খুলব। নিজের নামে তো পারি না, চারিদিকে শত্রু, নানা লোকে নানা কথা বলবে। তাই ভাবলাম, বিশ্বাসযোগ্য কে আছে, কাকে ভার দেওয়া যায়। তখন মনে হল, এত লোকের জন্য এত করেছি, অবনী আমার কতকালের বন্ধু, ওর জন্য কিছুই করা হয়নি। আপনি সারাজীবন কাজ করলেন, শেষ জীবনে আপনারও সুখ হল না। তাই অবনীকেই সব ভার দেব ঠিক করেছি। ওকে আর চাকরি করতে হবে না, আপিসে মাইনে যা পায় আমার কাছে তার বিশ গুণ কমিশন পাবে।

কীসের এজেন্সি বাবা ? সরোজের গলা কেঁপে যায়, চোখে জল এসে পড়ে। এতদিনে— এতদিনে কি তবে তার সারা জন্মের আদর্শনিষ্ঠার প্রতিদান আসবে ? এই কঠোর বাস্তববাদী জগতে অহিংসা দারিদ্র্য উপবাস বরণের পুরস্কার মিলবে ?

বলবখন বাড়ি গিয়ে। বিস্তারিত বলব।

মনে মনে বিড় বিড় করে অভ্যস্ত কয়েকটা মন্ত্র আউড়ে অনির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সরোজ নিশ্বাস ফেলে। ভগবান তবে ছপ্পড় ফুঁড়েই দিলেন !

ছেলেমেয়ে কটি ?

একটা মেয়ে আছে বছর তিনেকের। দাদামশায়ের কাছে থাকে। কাজের চাপে, জানেন জ্যাঠামশায়, বছর খানেকের মধ্যে মেয়েটাকে চোখে দেখিনি।

সরোজ মনে মনে বলে, যাট্ ! তিনিও কর্মী ছিলেন, এও কর্মী, এই বয়সে বেচারি কত সাফল্য লাভ করেছে, টাকাপয়সা মানসম্ভ্রম প্রভাব-প্রতিপত্তি ! কিন্তু এরা নীতি জানে না, ব্রত বোঝে না। একটা মোটে মেয়ে, কার জন্য তবে এই তপস্যা ? এরা মনে রাখে না যে গান্ধিজিরও সংসার ছিল, পুত্র-সন্তান ছিল ; তারপর যখন সময় এল তখন তিনি সন্ন্যাসী।

এরা যখন পৌঁছোল, বাড়িতে বাণী তখনও একা, শুধু পিসিমা বিছানায় শুয়ে জ্বরে ধুঁকছে। সরোজ প্রায় চটে যায়, চেঁচিয়ে বলে, কী আশ্চর্য, এখনও কেউ বাড়ি ফেরেনি ! এদের যদি কোনো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে।

জ্যোতির্ময় তাকে শান্ত করে : আহা আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাজে গিয়ে আটকে গেছে, আসবে সময়মতো।

কিন্তু অবনীর অনুপস্থিতি যে তাকে বিরক্ত করেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। পরক্ষণে সে প্রশ্ন করে, অবনী জরুরি কাজে গেছে বলছিলেন, কীসের কাজ ?

ও তার আপিসের ব্যাপার।

আপিসের ব্যাপার ? বিরক্তি কেটে জ্যোতির্ময়ের মুখে স্মিতভাব ফোটে। কেরানির কাছে আপিস কত গুরুতর এটা তার অজানা নয়।

বাণীর দিকে সে আশ্চর্য হয়েই তাকায়, কী দেখবে ভেবেছিল আর কী দেখছে, যেন চোখ দিয়েই যাচাই করে নিতে চায়। পাঁচ-ছবছর বিয়ে হয়েছে, কেরানির মেয়ে কেরানির বউ ! সে এখনও এমন আঁটো আছে, জীবন্ত আছে ! বাণীকে গরিব বাঙালি গেরস্ত ঘরের বিবাহিতা মেয়ের চিরন্তন মাতৃরূপা রূপে না দেখে সে রীতিমতো বিব্রত বোধ করে।

আপনাকে তো আগে তুমিই বলতাম, আপনার বোনের সঙ্গে দু বছর একসাথে পড়েছি। আশা কোথায় আছে ?

আশা, আশা একটু বিলাতের দিকে বেড়াতে গেছে। মানে, দেশে কেমন ওর মন টিকল না, একটা সুযোগ জুটে গেল, ও একটু আমেরিকা বেড়িয়ে আসতে গেল।

জ্যোতির্ময়েব অস্বস্তি বাণী টেব পায। কথাটা হালকা কবে উড়িয়ে দিতে সে বলে, ওব বেড়ানোব ভাবনা কি ? সাধ হলে বেবিয়ে পড়লেই হল। জামাকাপড় ছাড়ুন, চান কববেন ? বিশেষ চেষ্টায দু বালতি জল বেখেছি।

বিশেষ চেষ্টা কেন ?

জলেব বড়ো অভাব। সব জিনিসেবই অভাব—কেবানিব বাড়ি তো ! কথাটা বাণী না বলতেও পাবত। জ্যোতির্ময এ সব হিসাব কবেই এসেছে, বড়ো একটা মোটা লাভেব গোপনীয ব্যবস্থাব জন্য একটা দুটো দিন এ সব কষ্ট অসুবিধা সইতে সে নাবাজ নয।

নাইতে অনেক সময লাগিয়ে, সম্ভবত নিজেব উচ্চতম জগতেব অভ্যস্ত হিসাবনিকাশ চালচলন কী ভাবে মানুষেব জগতেব উপযোগী কবে ঢালাই কবে নেবে, কযেক ঘণ্টাব জন্য কবে নেবে (আটচল্লিশ ঘণ্টা যদি এখানে থাকতে হয, বাইবে নিজেব জবুবি কাজেব নামে দশ ঘণ্টা, ঘুমানোব নামে চোদ্দো ঘণ্টা, চিঠি লেখা কাগজ পড়া চিন্তা কবাব নামে দশ ঘণ্টা যাবে। তবু চোদ্দো ঘণ্টা থাকে ঘবোযা সামাজিক জীবনেব জন্য। অসুস্থতাব ভান কবে আবও ঘণ্টা দশেক কাটানো ছাড়া উপায নেই। অন্যভাবে ছাঁটাই কবে টোটালটা আবও কিছু কম কবা যায কি ? বোধ হয এবা ভড়কে যাবে। বন্ধুত্ব, প্রীতি, আদর্শ, নীতি, মানবতা ইত্যাদি ভান তো চাই, সবোজেব ছেলেকে চাকবি ছাড়িয়ে চোবা কাববাবে নামাতে হবে। তাব জীবনে, তাব পবিবাবে এটা প্রায বিপ্লবেব সমান।) সেটা ঠিক কবে সবল সহজ হাসিখুশি হয়ে জ্যোতির্ময বাবান্দায জেঁকে বসে।

দূবে এক হাত কাববাইড লাইটেব আলোয মজুবদেব গানেব আসবেব দিকে চেয়ে বলে, ও ব্যাটাদেবই আজকাল ফুর্তি ! স্ট্রাইক কবে কবে মোটা মজুবি কামাচ্ছে, সস্তায ফুর্তি কবছে। লোকে আমাদেব প্রফিটটাই দ্যাখে। একখানা গান শুনতে আমাদেব যে হাজাব টাকা খবচ সেটা কেউ হিসাব কবে না। হেসো না বাণী, ঠিক কথাই বলছি।

বলছেন না কি ?

বলছি না ? একটা ছোঁড়াকে বিনি পযসায মেযে সাজিয়ে ওবা নাচাচ্ছে, গান কবাচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো কী জমজমাট আসব ! আমবা যে মেযেটাব গান শুনে একটু মাতব, সে মেযেটাব বাপকে একটা খাতিবি চাকবি দিতেই হবে। মেযেটাকে শান্তিনিকেতনে পড়িয়ে ঘুবিয়ে আনতে হবে। বেড়িয়ো সিনেমায নাম কবাতে হবে। গান তো আসলে অষ্টবম্ভা, কাজেই নাম-টাম কবিয়ে নিয়ে না শুনলে তো মাতলামি আসবে না। একটা বোমাঞ্চকব গান শুনতে আমাদেব হাজাব কেন, তাব বেশি খবচা হয !

না শুনলেই হয ?

হয না। যাব মেযে বা বউ গান শোনাবে সেও সব জানে বোঝে কি না। সব কল টিপে হয। কল টেপাটাই আসল।

এমন যখন কাহিল অবস্থা, বাণী হেসে বলে, ও কল আপনাদেব বিগড়ে গেছে। আব কাজ দেবে না।

সবোজ বাণীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি। একটু হিসেব কবে কথাবার্তা বোলো। অবনীব একটা ব্যবস্থা কবে দেবে বলেছে, যা-তা বলে ওব সর্বনাশটা কোবো না।

আমি আপনাব ছেলেব সর্বনাশ কবব ? তাতে আমাব লাভ কী বাবা ?

প্রাণপণ উদাবতায সবোজ ক্রোধ সংববণ কবে। এবা কিছু জানে না বোঝে না মানে না। এদেব আধ্যাত্মিক জীবনে এমন দৈন্য যে স্বার্থপবেব মতো সর্বদা সব বিষযে স্বামীব সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ভাবে। আমাব কিছু হোক বা না হোক স্বামীব আমাব ভালো হোক এ চিন্তাও এদেব আসে না।

বাণী তার মুখের ভাব লক্ষ করে ভরসা দিয়ে বলে, ভাববেন না, বাড়িতে এসেছে মানুষটা, আমি প্রাণ দিয়ে আদরযত্ন করব।

দুখানা ঘর আর ওই বারান্দাটুকু সম্বল। ছোটো ঘরে বাণীরা থাকে, জ্যোতির্ময়ের কাছে চাদর চেয়ে নিয়ে বাণী সে ঘরে বিছানা করে দেয়, বলে, খাটে হাত-পা ছড়িয়ে বসুন, যা চেয়ার বাড়িতে ! কষ্ট পাবেন অনেক।

বেশ তো তোমাদের সঙ্গে নয় কষ্টই পেলাম।

পিঠ চাপড়ানো উদার আত্মীয়তা জাহিরের ভাব সুর ভাষা বাণী জানে। এ হল রক্ষাকর্তার পিতৃত্ববাদ। জ্যোতির্ময়ের অসুবিধাটাও বাণী টের পায়। তাদের দেখতে হচ্ছে অন্যদৃষ্টিতে, চোখ তার অভিনয়ের সংযম মানতে রাজি নয়। আগে খেয়াল ছিল না, জ্যোতির্ময়ের তাকানি দেখে বাণী টের পেয়েছে সে এখন একটা নতুন আকর্ষণ হয়েছে। বিয়ের আগে বাপের ঘাড়ে খেত পরত, বাপ যতই হোক, মজুর মেয়ের মতো তার মদ্দের হাড়ভাঙা খাটুনি নয়, যত ওঁচা হোক, খাওয়াও সে তুলনায় সে অনেক ভালো পায়।

ছেলেমেয়ে হয়নি ? জ্যোতির্ময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে। তার আসল কৌতূহলটা কী বাণীর তা বুঝতে কষ্ট হয় না, কারণ চোখ দিয়ে তার সর্বাঙ্গে কৌতূহলটার জবাব সে খুঁজছিল।

বাণী ধীরকণ্ঠেই বলে, একটা চিকিৎসা ছিল। তাতে বহু টাকা লাগে, জোগাড় করা গেল না।

জ্যোতির্ময়ের মাথা একটু নামে, দৃষ্টি মেঝেতে নেমে যায়।

আমায় লিখলে না কেন ?

এ প্রশ্নের আর জবাব কী ? বাণী চুপ করে থাকে।

অবনীর যদি মাসে পাঁচ-ছশোটাকা রোজগার হয়, খুশি হবে ?

হবো না ! কী বলেন !

জ্যোতির্ময় চোখ তোলে, কালকেই সব ব্যবস্থা করে দেব। নাম থাকবে সরোজবাবুর, ওঁর নামের একটা বিশেষ ইয়ে আছে। দেখাশোনা সব অবনীই করবে। কালকেই ও রিজাইন দিয়ে দিক।

রিজাইন বোধ হয় দিতে হবে না, এমনিই তাড়িয়ে দেবে।

কেন ?

স্ট্রাইক ফাইক করছে।

জ্যোতির্ময়ের চোখে সংশয় ঘনিয়ে আসে।—ও বাবা, ও সবে যায় না কি ? একটু ভেবে বলে, যাক গে, ও পেটি চাকরিও আর করতে হবে না, স্ট্রাইকেরও দরকার হবে না।

বাণী কিছু বলে না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল স্বামী-শ্বশুরের সর্বনাশ করতে কিছুতেই মুখ খুলবে না। তরকারি নামাতে সে রান্না ঘরে যায়। পরনের শাড়িখানাই একটু ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে নিয়ে একটা স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে জ্যোতির্ময়কে বলে, আধঘণ্টা বাবার সঙ্গে কথা বলুন। পাড়ার একটি মেয়েকে পড়াই, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েই চলে আসব।

জ্যোতির্ময় আশ্চর্য হয়, ক্ষুণ্ণও হয়। কাল স্বামী চাকরি ছাড়বে, মাসে পাঁচ-ছশোটাকা রোজগার শুরু করবে, তার খাতিরেও সে একবেলা মেয়ে পড়ানো কামাই করতে সাহস পেল না।

অবনীর ফিরতে রাত প্রায় নটা বেজে যায়। বাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কী হল ?

ঠিক হল। সবাই একমত।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সবে অবনী জামাকাপড় ছেড়েছে, সে ফিরেছে টের পেয়েই সরোজ তাকে ব্যগ্রভাবে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। বাণী যখন মেয়ে পড়াতে গিয়েছিল সে

সময় জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তার এজেন্সি সম্পর্কে আরও আলাপ হয়েছে। সমস্ত ব্যাপার জেনে সরোজের যেমন হয়েছে ভয় তেমনি বেড়েছে উত্তেজনা। নিজে আগে ছেলের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তাকে আলাপ আলোচনা করতে দিতে সে রাজি নয়। এজেন্সির প্রস্তাবে সায় দিতে ছেলের নতুন বিবেকে বাধবে বলেই সরোজের ভয়, সোজাসুজি হয়তো সে জ্যোতির্ময়কে বলে বসবে : আমি তোমার ওই লোকঠকানো ব্যাপার নেই।

তাহলেই সর্বনাশ !

জ্যোতির্ময় তোমায় বলেছে কিছু ? উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে সরোজের, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

কখন বলবে ?

শোনো তবে বলি—

সরোজ জ্যোতির্ময়ের বেনামি এজেন্সির ব্যাপারটা ছেলেকে খুলে বলতে শুরু করে। অবনীর শ্রান্ত ক্লান্ত মুখ দেখে আলোচনাটা খাওয়ার পর আরম্ভ করার কথা বলতে গিয়ে বাণী ঠোঁট কামড়ে চুপ করে যায়। খিদের কষ্ট অবনীর সইবে, কিন্তু একটু শান্ত হতে না পারলে যে কোনো মুহূর্তে বুড়ো মানুষটার হার্ট ফেল করা আশ্চর্য নয়। সেইখানে একটা মাদুর বিছিয়ে বাণী দু হাত ধরে সরোজকে বসিয়ে দেয়, বলে, বসে কথা বলুন বাবা, ব্যস্ত হবেন না।

রাগে দুঃখে তার চোখে তখন প্রায় জল এসে গিয়েছে। খিদেয় মানুষ মরে যাক, জীবন অচল হয়ে আসুক, এমন সব দুর্বলতা বাধা হয়ে মানুষকে ব্যস্ত হতে দেবে না, তাড়াতাড়ি কিছু করতে দেবে না।

সরোজ এই বলে, শেষ করে, সারা জীবন আমি নীতি আর আদর্শ বাঁচিয়ে এসেছি, এতে কোনো দোষ দেখলে আমি নিজেই বারণ করতাম। মানুষের নীতিধর্ম অন্তরে, বাইরেটা দেখলেই শুধু চলে না। তুমি যেন জ্যোতির্ময়কে না বলে বোসো না।

অবনী বাণীর দিকে তাকায়। বাণী যেন জানত সে এই ভাবে তাকাবে, পাশের দিকে সরোজের চোখের আড়ালে সে দাঁড়িয়েছিল। নীরবে ঠোঁট কামড়ে বাণী চোখের ইশারায় সরোজকে দেখিয়ে দেয়। ইঙ্গিতটার মানে বোঝা সহজ। ধৈর্য হারালে চলবে না, ব্যস্ত হলে চলবে না, বুড়ো বাপটা যখন আছে তার অস্তিত্বটাও মানতে হবে। অবনীর শান্ত চোখে বিপজ্জনক অসহিষ্ণু ক্রোধ ঝলসে উঠছিল, বাণীর ইঙ্গিত না পেলে সে হয়তো ভুলেই যেত আসল কারসাজি কার, অসহায় নিরুপায় বাপকে দাবড়ে দিত।

কী ভয়ংকর মুহূর্তটা যে কেটে যায় বোঝে শুধু বাণী আর অবনী। ঘৃণার মতো প্রচণ্ড মহৎ হৃদয়াবেগকে যুগে যুগে যারা অনেক কায়দায় বিপথে উলটো দিকে চালিত করে ঘরে ঘরে ভুল-বোঝা অশান্তি আর হতাশা সৃষ্টি করেছে তাদের কৌশল আরও একবার প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল !

জ্যোতির্ময় ঠকাবে মানুষকে, লোকচক্ষুর আড়ালে সে হাজার হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে বাগাবার ব্যবস্থায় কাজে লাগাবে সরল বোকা অসহায় সরোজ আর তার গরিব কেরানি ছেলে অবনীকে, আর একটু হলে আড়ালের মানুষ তাকে আড়ালেই রেখে ফাটাফাটি হয়ে যেত সরোজ আর অবনীর মধ্যে।

অবনী মৃদু শান্ত স্বরে বলে, আপনি যদি জোর করেন আপনি যা বলেন তাই হবে। আমি আপনার বিরুদ্ধে যাব না। কিন্তু আমি ভাবছি, আমার ভালোর জন্যই আপনি এটা করতে বলছেন। সবার কাছে হীন হয়ে আমার সুখ শান্তি যদি নষ্ট হয়, আপনি কি সুখী হতে পারবেন ?

ওই তো, ওই তো দোষ তোমার ! ক্ষুব্ধ অভিযোগের সুরে সরোজ বলে। কিন্তু অভিমান সাধারণ হৃদয়াবেগ, মোটেই মারাত্মক নয়। সারা জীবনের ত্যাগ স্বীকারের পুরস্কার যেচে ঘরে এসেছে অথচ ছেলে তা বাতিল করে দেবে, এই আতঙ্কে যে কাঁপুনি ধরেছিল সরোজের তা কেটে গেছে। ক্ষুব্ধ হোক আর অভিমান করুক, এখন সে শান্ত হয়েছে, আচমকা তার হার্ট ফেল করে মরার সম্ভাবনা নেই।

দুবার নাক ঝেড়ে, বাণীর কাছে এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে সরোজ বলে, তোমার ঠেকছে কীসে ? এ তো চুরি-চামারির ব্যাপার নয়, সাধারণ ব্যাবসার কথা। কেউ না কেউ এজেন্সিটা পেত, এজেন্সি দেওয়ার ব্যাপারে জ্যোতির্ময়ের হাত ছিল, সে অন্যকে না দিয়ে তলে তলে নিজের জন্য ব্যবস্থা করেছে। এটা একটু অন্যায় বটে, দেশের লোককে জানানো হল একরকম কাজে হল অন্যরকম। কিন্তু বিশেষ কী এসে গেছে ? অন্য লোকেও এজেন্সিটা চালাত, জ্যোতির্ময় নিজের লোক দিয়ে সেটা চালাবে। এজেন্সি চালানোটাই আসল কথা। তাতেই দেশেব মঙ্গল। এতে তোমার আপত্তি কী ?

অবনী বলে, এক কাজ করা যাক। জ্যোতি আপনার নামে এজেন্সি করতে চায়, তাই করুক। আপনি মাইনে দিয়ে লোক রাখুন, এজেন্সি চালান। আমি নাই বা রইলাম ওর মধ্যে।

আশেপাশের তিন চারটে বাড়িতে রেডিয়ো বিনিয়ে বিনিয়ে গানের নামে কাঁদছে। তবে সুখের বিষয়, এ কাঁদুনি ঢোল করতাল ঘুঙুর আর সমবেত গলার আওয়াজে খানিকটা চাপা পড়ে গেছে।

সরোজ নিশ্বাস ফেলে বলে, ভেবে দেখি। তোমরা খাবে যাও। আমি আজ কিছু খাব না বউমা।

বাণী চট করে সামনে আসে।—না খাওয়াই ভালো। পাতলা একটু বার্লি করে বেখেছি, চুমুক দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

খাদ্য দেখে রীতিমতো ক্রোধের সঞ্চার হয় জ্যোতির্ময়ের, যদিও তার জন্যই বিশেষভাবে সবোজ এক পোয়া মাছ আনিয়েছিল এবং মাছটা বেশির ভাগ তাকেই দেওযা হযেছে। তবে বাগ কবে যেখানে লাভ নেই সেখানে জ্যোতির্ময় রাগ চাপতে জানে। তাব শুধু লাভের হিসাব। বিনা লাভে রাগ দুঃখ খরচ করাও তার স্বভাব নয়।

বাঃ ! লাউ শাকটা তো খাসা হয়েছে !

বাণী বলে, ওটা পুঁই-চচ্চড়ি। জানেন, পুঁইশাক ছিল বলে বাঙালি বেঁচে আছে। ভাতেব বদলে কচু আর মাছ-মাংসের বদলে পুঁই। কচু আর পুঁই না থাকলে—

কুচো চিংড়ি বাদ দিও না।—অবনী বলে।

জ্যোতির্ময় খিলখিল করে হেসে ওঠে। কী করবে কী বলবে সে ভেবে পাচ্ছিল না।

চাদর গায়ে জড়িয়ে পিসিমা ধীরে ধীরে ঘরে এসে দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁষে বসে। ধীরে ধীরে বলে, সলিল আসেনি, না ?

বাণী বলে, না পিসিমা, এখনও ফেরেনি।

পিসিমা তেমনই মৃদু স্বরে বলে, বেরোবার আগে অনেকক্ষণ কপাল টিপে দিয়ে গেল। তখনই বুঝেছি মিটিংয়ে গোলমাল হতে পারে, নইলে মার জন্য ছেলের অত দরদ হয় ! নাও ফিরতে পারে ভেবে গেছে।

এখনও ফেরার সময় যায়নি।

পিসিমা নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। এদিকে জ্যোতির্ময়ের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ দেখায়।

সলিল কে ? কীসের মিটিং ?

জবাব শুনে তার মুখ আরও পাংশু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ভাত গিলতে পারে না। বারবার চোখ তুলে সে বিধবা পিসিমার শীর্ণ কিন্তু শান্ত মুখখানার দিকে তাকায়।

তাদের খাওয়া শেষ হতে হতে সলিল বাড়ি আসে। বলে, বাঃ, সবাই পেট-পূজায় লেগে গেছ।

জ্যোতির্ময়ের মতো মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতি তাকে মোটেই বিব্রত করেছে মনে হয় না। আধ ময়লা পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলে হাত ধুয়ে একটা আসন টেনে বসে পড়ে বলে, চট করে থালা আনো বউদি, আগে খাব তার পর অন্যকথা।

ভাতের থালা সামনে পাওয়া মাত্র সে খেতে আরম্ভ করে, কোনো দিকে তাকায় না। জ্যোতির্ময় যেন আশ্চর্য হয়ে এই পুঁজি-করা প্রাণবন্ত প্রচণ্ড ক্ষুধার অভিব্যক্তি চেয়ে দ্যাখে। অবনীর খাওয়ার রকমে সে জোরালো খিদে দেখেছিল, তবে এতটা নয়। তার বোধ হয় বিশ্বাস হয় না যে, ভদ্র ঘরেও এত খিদে পায় এবং সে খিদে চেপে রাখতে হয় রেশনের নির্দিষ্ট অন্নের জন্য।

অবনী বলে, মিটিং কেমন হল ?

গ্র্যান্ড। পরশু জয়েন্ট প্রসেশন।

কিছুক্ষণ সলিলের সঙ্গেই সকলে কথা কয়, জ্যোতির্ময়কে তারা যেন ভুলে গেছে। শরীরটা দুর্বল বোধ করে সরোজ শুয়ে পড়েছিল, এখানে উপস্থিত থাকলে তার হৃৎস্পন্দন বোধ হয় বন্ধ হয়ে যেত। জ্যোতির্ময়ের মুখে গভীর চিন্তার ছায়া নেমে এসেছে।

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে সে উসখুস করে। নাক ঝাড়ে, গলা খাঁকারি দেয়, নড়েচড়ে নানাভাবে বসে, হাতের তালু দিয়ে নিজের থুতনি ঘষে।

টায়ারড লাগছে ? তুমি ববং তবে শুয়ে পড়ো। অবনী বলে।

টায়ারড নয়। ভাবছি, তোমাদের বড়োই অসুবিধা করলাম। ঘরের এত টানাটানি জানলে আমি—

আমাদেব কোনো অসুবিধে নেই, ভেবো না। অসুবিধা তোমাবই।

বাণী জলের কুঁজো আর গ্লাস এনেছিল, সে বলে, আমাদেব অতিথি আসে না ?

তবু জ্যোতির্ময় উশখুশ করে। গ্লাস জল খেয়ে নামিয়ে রাখা জ্বলন্ত সিগারেটটার কথা ভুলে নতুন আরেকটা সিগারেট ধরায়।

আচমকা সে বলে, একটা ভুল হয়ে গেছে, ইস ! আমায় তো ভাই যেতে হবে।

বেরোবে ? তা বেশ তো। ফিবতে বেশ বাতে হবে না কি ?

জিনিসপত্র নিয়েই যাব। আমার কি আব বিশ্রাম আছে ? তোমাদেব চিঠি লেখবার পর এটা ঠিক হয়, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমাকে হোটেলেই যেতে হবে, সকালে কজন বড়ো বড়ো লোক আসবে, জরুবি কনফারেন্স।

অবনী বলে, ও !

জ্যোতির্ময় হাসবার চেষ্টা করে, বলে, ভেবেছিলাম হোটেলেই উঠব, সেখান থেকে এসে তোদের সঙ্গে দেখা করে যাব। তোব বাবাকে দেখে সব ভুলে গেলাম। এত দিন পরে তোদের সঙ্গে দেখা, কী ভালোই যে লাগছে। হোটেলেব কথাটা স্রেফ ভুলে গেছি !

বাণী খেয়ে উঠে শোনে, সলিল ট্যাক্সি ডাকতে গেছে। জ্যোতির্ময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। ট্যাক্সি এলে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা দেখা দেয়। সরোজের বোধ হয় ঘুম এসেছে, তাকে না জানিয়েই কি জ্যোতির্ময় চলে যাবে ?

আমরা বুঝিয়ে বলব। এমনি ভালো ঘুম হয় না, ঘুম যখন এসেছে ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই।

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জ্যোতির্ময় ট্যাক্সিতে ওঠে। ট্যাক্সি চলে গেলে বাণীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচা গেল বাবা। নিজেই আমাদের সমস্যা মিটিয়ে দিল।

অবনী বলে, তাই তো দেয়।

রাত্রে শুতে যাবার আগে বাণী একবার সরোজের খবর নিতে যায়। শ্রান্ত অবনী আগে শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, বাণীর হাতের নাড়ায় জেগে উঠে তার মুখ দেখেই সে খানিকটা বুঝতে পারে। নিঃশব্দে গিয়ে দুজনে সরোজের চৌকিতে বিছানো সামান্য সাধারণ বিছানার পাশে দাঁড়ায়, সামান্য ইঙ্গিতটুকু পাবে না জেনেও অবনী জীবনের সন্ধান করে। বাণীর দু চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে বুড়ো সরোজ চিরতরে ঘুমিয়ে গেছে।

ঘর করলাম বাহির

মাঝে মাঝে এই হোটেলে খেতে আসি।

গরিব মানুষের হোটেল, যারা খেতে আসে তারা অধিকাংশই কারখানা আপিসের মজুর কেরানি। একপ্রস্থ ভাত, ডালের জল আর সবুজ একটা ঘন্ট আজকালকার বাজার হিসাবে মোটামুটি সস্তা। পাইস সিস্টেম প্রচলিত, গাঁটে কড়ি কম থাকলে আধপেটা সিকিপেটা খেতে বাধা নেই। পেটে অন্তত ভাত পড়েছে এ সান্ত্বনাটুকু কেনার সাধ্য এখানে হয়, খিদের সঙ্গে বোঝাপড়া জল দিয়েই করতে হোক। মাছ মাংস পাওয়া যায়, চড়া দাম। অবসাদ বোধ করলে, বড়োলোকের মিথ্যা প্রতারণা ভরা কুৎসিত জগতের ছড়ানো মায়াজালের ছোঁয়াচ লেগে লেগে নিজেকে ক্লেদাক্ত অশুচি মনে হলে, এইখানে এসে বসি। এই মলিন নোংরা পরিবেশে মজুর কেরানির খাদ্য আর খাওয়ার রকম দেখতে দেখতে জগতের সীমাহীন দুর্দান্ত অতৃপ্ত ক্ষুধার অস্তিত্ব অনুভব করি। অসংখ্য চেতনায় তারই প্রতিফলন ঘৃণা-যজ্ঞের মহান পবিত্র আগুন হয়ে অনির্বাণ জ্বলছে, নিজের চেতনায় তার উত্তাপ পাই। নিজেকে সুস্থ, শুচি মনে হয়।

প্রায় তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। সকাল থেকে এঁটো থালাবাটি তুলে তুলে ন্যাতা বুলিয়ে যাওয়ার ফলে খাওয়ার ঘরে বিছানো আসনগুলির সম্মুখের মেঝে চ্যাপচেপে কাদাটে হয়ে গেছে। খাদ্যার্থীদের ভিড় এখন কম। খেতে বসব কিনা ভাবছি এমন সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, পশুপতি জুতো খুলে খাওয়ার ঘরে একটা আসন দখল করে বসল।

এত বেলায় পশুপতি আপিস যায়নি এটা আমার বিস্ময়ের কারণ নয়, আমি জানতাম তাদের আপিসে আজ ধর্মঘট। কাছাকাছি একটা ভাড়াটে বাড়িতে পশুপতি সপরিবারে বাস করে। বাড়ি এত কাছে তবু এত বেলায় সে হোটেলে ভাত খেতে এসেছে কেন এটাই আমার কাছে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকল।

আমিও পাশের আসনে বসি, ভাত দিতে বলি। ইতিমধ্যেই পশুপতির খাদ্য এসে গিয়েছিল, হোটেলের ঠাকুর অদ্ভুত রকম চটপটে হয়। পিতলের বাটিতে মশলা গোলা জলের মধ্যে পেন্সিলের দাগ তোলা রবারের মতো মাছের টুকরোটির দিকে চেয়ে পশুপতি বলে, ছ আনার এই মাছ !

বিলাসিতার দাম দেবে না ? হোটেলেরও তো মালিক আছে !

তা হোটেলে কেন, বাড়িতে রান্না হয়নি ? অসুখ নাকি ?

পশুপতি নিশ্বাস ফেলে বলে, অসুখ নয়, যুদ্ধ। কদিন ধরেই চলেছে, আজ চরম সংঘাত। এক পক্ষে আমি অপর পক্ষে বাড়ির সবাই।

মানুষকে উত্তপ্ত করলে তার ভাষার জড়তা কেটে যায়। আমি ইচ্ছা করেই হালকা সুরে বলি, বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, তাই বুঝি চিরকেলে প্রথায় ভাতের উপর রাগ করে বেরিয়ে এসেছ ?

সে শান্ত উদার চোখে তাকায়, ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু করুণার হাসি ফোটে। বুঝতে পারি সে ভাবছে : এ লোকটা কোন জগতে বাস করে ! শখের কলহ আর ভাতের উপর গোসা ! ও সব ন্যাকামির দিন কোন কালে পার হয়ে গেছে মধ্যবিত্তের জীবনে সে খবরটাও রাখে না ?

মুখে বলে, ঝগড়াঝাঁটি ? ঝগড়াঝাঁটিই বটে ! কদিন আজ বাড়িতে পারিবারিক, সামাজিক, দাম্পত্য, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক যত রকম লড়াই আছে সব চলছে—শুধু বোধ হয় সাম্প্রদায়িক যুদ্ধটা বাদ। বাড়িতে আজ ও পক্ষের হাঙ্গার স্ট্রাইক, রাঁধেনি। আগে থেকে নোটিশ দিয়েছে আজ আপিস না গেলে বরখাস্ত করবে। বাড়ির সকলে তা জানে। এ বাজারে চাকরি পাব ? না খেয়ে মরতেই হবে সকলকে। উপোস করিয়ে মারতেই যখন চাই সকলকে, তাই যখন আমার প্রাণের ইচ্ছা,

আজ থেকেই উপোস শুরু হোক ! দুদিন আগে আর পরে। মা বাবা পিসিমা বউ সবাই সকাল থেকে বিছানায় শুয়ে হা-হুতাশ করছে, চোখের জল ফেলছে। আড়চোখে আড়চোখে দেখছে নটার মধ্যে গুড় মুড়ি খেয়ে গুটিগুটি আপিস রওনা দেওয়ার আয়োজন করছি কি না।

শুকনো ভাতের একটা গেরাস মুখে দিয়ে বাটিতে চুমুক দিয়ে সে একটু ডাল মুখে নেয়। এত পাতলা ডাল যে মেখে খাওয়া সম্ভব নয়। তার হাত একটু কাঁপছিল। কল্পনায় তার বাড়ির দৃশ্যটা রূপ নিয়ে আমাকেও সচকিত করে দেয়। পরিবারেব একমাত্র উপার্জনশীল মানুষটির বিরুদ্ধে এ তো প্রায় সমগ্র পরিবারটির সংঘবদ্ধ আক্রমণ এবং সকলেই তারা ওই মানুষটির উপর নির্ভরশীল। তবু ব্যাপারটা বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি মনে হয়। একটু যেন অবাস্তব, অস্বাভাবিক ঘেঁষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে কে না ধর্মঘট করে, না করে উপায় আছে কার ? মা বাবা মাসিপিসি ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে বেঁচে থাকার দায়ে ঠেকেছে বলেই কেরানি মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে নামে, ওটা তার শখ নয়। তার মানেই তো এই যে বাড়ির অন্য সব মানুষের জীবনযাত্রাও অতি শোচনীয় অবস্থায় এসে ঠেকেছে।

একদিনে এই শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয় না, ক্রমে ক্রমে দুর্দশা বাড়ে এবং তাতেই বাড়িতে কমবেশি সমর্থন সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন তো নয় যে আপনজনকে বাদ দিয়ে, তাদের ভালোমন্দের হিসেব শিকেয় তুলে, শুধু নিজের জন্য নিজের খেয়ালে পশুপতি আজ আপিস যায়নি। ধর্মঘট তো ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়াব অ্যাডভেঞ্চাব নয়।

কত মাইনে পাও ?

এই দেড়শোর মতো।

ব্যাপাবটা এতে পরিষ্কার হয না। পরিবারটি উলঙ্গ হয়ে উপোস দিয়ে মরার অবস্থার মুখোমুখি পৌঁছাযনি, এই পর্যন্ত। কিন্তু জীবনেব সমস্ত সাধ আহ্লাদ আশা আনন্দ সার্থকতা বৈচিত্র্য বিকাশের সম্ভাবনা ছেঁটে ফেলে ডালপালা বর্জিত গাছের মতো বেঁচে থাকা তো এমন লোভনীয় নয় যে পরিবর্তনের চেষ্টাতেই ভীত হয়ে উঠবে তার আত্মীয়স্বজন। তাব মুখ আলগা করাব জন্য আরও একটা খোঁচা দিই, বলি, তোমার যদি কিছুমাত্র মনেব জোর থাকত—

তুমি বুঝবে না।—মুখের কাছ থেকে ভাতের গেরাস নামিয়ে সে বলে—আমি চিরদিন স্বাধীনতা চেয়েছি, চিরটা কাল আমি সবার চেয়ে পরাধীন হয়ে রইলাম। কী ভাবি আর কী হয়। কী চাই আর কী পাই। কলেজে পড়বার সময় ভেবেছিলাম ডাক্তার হব, শেষ পর্যন্ত হলাম কেরানি। তাও বাবার চেষ্টায়, আমার নিজের গুণে নয়। জানোই তো কী অবস্থা হয, ভবিষ্যতের স্বপ্ন না ছাই, যেমন তেমন একটা উপার্জনের ব্যবস্থাব জন্য পাগল হয়ে উঠতে হয়। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে উঠেও আমি কিছু করতে পারিনি, বাবা ধন্না দিয়ে ধরাধরি করে চাকরিটা জুটিয়ে দেন। আজ আমার কাণ্ডে বাবা স্তম্ভিত হয়ে যাবেন এ আর আশ্চর্য কী ? প্রথমেই কী বললেন জানো ? বললেন, আমি উমেশবাবুকে মুখ দেখাব কী করে ! মনে হল যেন কেঁদেই ফেলবেন। উমেশবাবু চাকরিটা দিয়েছিলেন। কাজেই আমি কত বড়ো অকৃতজ্ঞতার কাজ করছি, কত বড়ো অন্যায় করছি ! বাবা খুব নিষ্ঠাবান লোক। এখনও খদ্দর পরেন।

মিনিটখানেক সে নীরবে খেয়ে যায়। আচমকা একটু অদ্ভুতভাবে হাসে : কত তর্ক, কত বোঝানো, কত হা-হুতাশ মান অভিমান। তবে দেশপ্রেম, শিশুরাষ্ট্র এ সব যুক্তি তোলেননি, আমারও তো বয়স হয়েছে বোঝেন। তাঁর একটা যুক্তি হল, আমি প্রায় অফিসার—একটুখানি নীচে। লেগে থাকলে পেটি অফিসার হতে পারব। যারা পঞ্চাশ ষাট টাকার কেরানি, তারা যা খুশি করুক, আমি কেন তাদের দলে ভিড়ব ? আসলে এ সব যুক্তিতর্ক বড়ো কথা নয়, ঘরোয়া ব্যাপার তো। মায়া মমতা স্নেহের দাবির চাপটাই মারাত্মক। বাড়িতে যেন গভীর শোকের ছায়া পড়েছে, সর্বনাশ আসন্ন। দিবারাত্রি কানের কাছে শুধু গুঞ্জন, কী উপায় হবে ? হায়, হায়, উপায় কী হবে ? বোনের বিয়ে আসছে, আমার স্ত্রীর সাত মাস, বাবার অসুস্থ শরীর—

খাবার ঘরে লোক চলাচল করে আর হোটেলের মাছির ঝাঁক ভনভনিয়ে উড়তে থাকে। রান্নাঘরে ঠাকুর আর ঝিয়ের মধ্যে কী নিয়ে কলহ বেধেছে, ঝির তীক্ষ্ণ চড়া গলা ঝনঝন করে বাজছে। চিরদিন উপরের মিতালির ভরসাটুকু সম্বল করে শূন্যে ঝুলে থাকা মধ্যবিত্তের চেতনায় ফাঁস ছিঁড়ে আছড়ে পড়ার আতঙ্ক যে কত সহস্র রূপে পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল, নীচের ওই নিবিড় কালো হতাশার অতল গভীরতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার করুণ চেষ্টাতেই কীভাবে ব্যর্থ ব্যাহত জীবন কাটত, পশুপতি তার বর্ণনা দিতে পারে না। ছেলেবেলাতেই এই ভয় আর ভয়ের সংস্কার দেখে ভয় পেয়ে মাটির মানুষের কাছে পালিয়েছি সাহস খুঁজতে, তার অপটু কথা থেকেই কল্পনা করে নিতে পারি কীসের ইঙ্গিত সে করছে। কিন্তু আজও কি এত ভয় আছে ? দ্বিধা আছে, সংশয় আছে, বিভ্রান্তির হতাশা আছে কিন্তু এত আতঙ্ক ? দু-একজনের থাকতে পারে, সমগ্র পরিবারটির কী করে থাকে ? কেউ একজন চেষ্টা করে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে না তুললে এ তো সম্ভব নয় !

আমার মনের প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন পশুপতি বলে, স্ত্রী গোড়ায় আমার দলেই ছিল। অন্দরে থাকলেও বাইরের খবর তো কিছু কিছু পায়, আমরা যা ভাবি আর অনুভব করি দাম্পত্যালাপে কিছুটা তো চুঁইয়ে গিয়ে মর্মে পৌঁছায়। খানিকটা বুঝত যে এটা আমার একার ব্যাপার নয়, আপিসের সবাই মিলে করছি। কিন্তু বউটাও শেষে বিগড়ে গেল। বেচারির সাত মাস, কানের কাছে সকলে ক্রমাগত মন্ত্র জপছে, কতক্ষণ ভরসা রাখবে ? বাবা বোধ হয় টের পেলেন, একা আমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না। আমার দিদিকে নিয়ে এলেন। বেশ মোটাসোটা জবরদস্তি গিন্নিবান্নি, ছেলেপিলে নিয়ে সচ্ছল সংসার, খুব সাংসারিক বুদ্ধি। সবাই মিলে কী যে বোঝাল, বউটিও আক্রমণ শুরু করে দিল। আর সে কী আক্রমণ ! একটা নমুনা শুনবে ? রাত দুপুরে কাঁদে আর বলে আমার এই অবস্থায় তুমি আমার দিকে তাকাবে না ? দু ছেলের মা বউ যখন পেটের ভারে এলিয়ে পড়ে ওরকম ভাবে বলে, ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ায় অনুমান করতে পার ? জানি না কী করে শক্ত আছি, খাড়া আছি।

শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে নীরবে সায় দিই।

পশুপতি মৃদুস্বরে বলে যায়, আপিসের লড়াই সহজ। এতগুলি লোক একসঙ্গে আছি, এক চিন্তা, এক উদ্দেশ্য। জানি গুঁতো খেলে সবাই ভাগাভাগি করে খাব। শালা, ঘরের লড়াইয়ে প্রাণটা যায় যায় হয়েছে। ভাবলাম বটে যে আমায় কাবু করতে ওরা উপোস করে শুয়ে আছে, আমি কেন উপোস করে মরি ? তাই হোটেল খেতে এলাম। কিন্তু গলা দিয়ে ভাত কি গলে ?

তোমার ওই দিদিটি এখনও আছেন ?

আছে। ভাইয়ের চাকরির মায়া কাটিয়ে যেতে পারছে না।

বলতে বলতে মুখ তুলে সে চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে থাকে। পশুপতির স্ত্রী সাধারণভাবে একখানা শাড়ি পরে একেবারে হোটেলের খাবার ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার কাছে বাইরে তার বাবা মা আর কিশোরী বোনটিকেও দেখা যায়। পিসিমা বোধ হয় আসেনি। বড়ো দিদিটিও নয়।

এই যে তুমি এখানে !—পশুপতির স্ত্রী যেন কত জন্মের আটকানো দম ছাড়ে— মাগো মা, না বলে এমন করে চলে আসে ? তারপর পশুপতির বাবা ভেতরে আসে। গভীর স্নেহাতুর চোখে খানিকক্ষণ চুপচাপ চেয়েই থাকে ছেলের দিকে।

আচমকা বলে, তা তোমার মনের ইচ্ছাটা জোর করে বললেই পারতে ! তোমার বিচার বিবেচনার উপর আমরা কি কথা কইতে যাব ?

চেয়ে দেখি, পশুপতির ক্লিষ্ট মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আপনা থেকে সিধে হয়ে গেছে তার বাঁকা মেরুদণ্ডটা। মধ্যস্থ হয়ে আমি একটি প্রস্তাব করি, প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। পশুপতির পরিবারটি বোধ হয় এই প্রথম ঘর থাকতে বাইরের এই নোংরা হোটেলে আসন পেতে ভাত খেতে বসে।

সখী

সদরের কড়া নড়তে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বিভা বলে, দ্যাখ তো রিণা কে, কাদের চায়।

উপরে নীচে পাঁচ ঘর ভাড়াটে। উপরে তিন, নীচে দুই। বাইরে লোক এলে দরজা খুলে খোঁজ নেবার দায়িত্ব স্বভাবতই নীচেব তলার ভাড়াটে তাদের উপর পড়েছে, বিভা এবং কল্যাণীদের। সদর থেকে ভিজে স্যাঁতসেঁতে একরত্তি উঠানটুকু পর্যন্ত সবু প্যাসেজের এ পাশের ঘরটা তাদের, ও পাশেরটা কল্যাণীদের। ভিতরে আরও একখানা করে ছোটো ঘর তারা পেয়েছে—কিন্তু রান্নাঘব মোটে একটি। কল্যাণীরা রান্নাঘরের ভেতরে রাঁধে, বিভা রাঁধে বারান্দায়। তবে সুবিধা অসুবিধার হিসাব ধরলে লাভটা কাদের হয়েছে ঠিক করা অসম্ভব। রান্নাঘরখানা ঘুপচি, আলোবাতাস খেলে না, উনান ধরলে একেবারে হাড়কাঁপানো দিনগুলি ছাড়া শীতকালেও ভাপসা গরমে বেশ কষ্ট হয়। নিশ্বাস আটকে আসে, মাঝে মাঝে ছুটে বেড়িয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশের ফালিটুকুর দিকে মুখ তুলে হাঁপ ছাড়তে হয়। বাবান্দায় আবার জায়গা এই এতটুকু, নড়াচড়া করতেও অসুবিধা হয়।

সাধারণত কল্যাণীরাই সদরের কড়া নাড়ায় বেশি সাড়া দেয়—তাড়াতাড়ি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে দেয়। বিভাদের বা উপবতলার ভাড়াটেদের কাছে লোকজন কদাচিৎ আসে, কল্যাণীরা নিজেবাও সংখ্যায অনেক বেশি, দেখা করতে বেড়াতে বা কাজে বাইবেব লোকও ওদের কাছেই বেশি আসে। অন্য ভাড়াটেদেব তুলনায় বাইরের জগতের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ অনেক বেশি।

কল্যাণীরা সম্ভবত রান্নাঘবে খেতে বসেছে বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছে, বিভার রান্না খাওয়াব পাট অনেক আগেই চুকে যায়। দু-এক মিনিট দেখে ওদেব কাছেই লোক এসেছে ধরে নিয়েও শোয়া বিণাকে তুলে সে খবব নিতে পাঠিয়ে দেয়। এটুকু কবতে হয় এক বাড়িতে থাকলে।

ক্ষীণ অস্পষ্ট আশা কি জাগে বিভার মনে যে আজ হযতো তার কাছেই কেউ এসেছে ? কেউ তো এক বকম আসেই না, যদিই বা কেউ আজ এসে থাকে !

একটু পরেই ফ্রক পরা তিন বছরের একটি মেযের হাত ধরে বিভাব সমবয়সি একটি মেযে খোলা দবজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ভাবতে পেরেছিলি ? কেমন চমকে দিয়েছি !

তাকে দেখেই বিভা ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, ব্যাকুল ও উৎসুক কণ্ঠে সে বলে, রানী ! ইস, কী রোগা হয়ে গেছিস ? কী চেহারা হয়েছে তোর ?

রানী যেন বেশ একটু ভড়কে যায়, মুখের হাসি খানিকটা মিলিয়ে আসে।—তা যদি বলিস, তুইও তো কম রোগা হসনি। কালো হয়ে গেছিস যে, তোর অমন রং ছিল ?

দুই সখী ব্যাকুল ও প্রায় খানিকটা ভীতভাবে পরস্পরের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে। দুজনেরই ভাঙাচোরা অতীতের প্রতিবিম্ব নিয়ে যেন দুটি আয়নার মতো তারা পরস্পরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন খারাপ হয়ে গেছে চেহারা, এত ময়লা হয়েছে রঙ, এমন ক্লিষ্ট হয়েছে চোখ ? এতখানি উপে গেছে স্বাস্থ্যের জ্যোতি, রূপ-লাবণ্য ? প্রতিদিন আয়নার সামনে তারা চুল বাঁধে, মুখে পাউডার সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, নিজেকে রোগা মনে হয়, কখনও একটু আপশোশ জাগে। কিন্তু আজ বন্ধুর চেহারা চেয়ে দেখার আগে পর্যন্ত তারা ধরতেও পারেনি ক বছরে কী শোচনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে নিজের দেহেও, কী ভাবে শুকিয়ে সিটকে গেছে।

আয় রানী, বোস। কটি হল ?

বিভা রানীর মেয়ের হাত ধরে কোলে টেনে নেয়।

কটি আবার ? এই একটি। তোর ?

কতকাল কেটেছে, ক বছর ? এই তো সেদিন তাদের বিয়ে হল, যুদ্ধ বাধার পর একে একে দুজনেরই। বছর পাঁচেক কেটেছে তাদের শেষ দেখা হবার পর। পাঁচ বছরে একটি মেয়ে হয়ে রানীর সেই আঁটো ছিপছিপে গড়ন, যা দেখে তার প্রতিদিন হিংসা হত, সে গড়ন ভেঙে এমন চাঁচাছোলা প্যাকাটির মতো বেঢপ হয়ে গেছে ? কণ্ঠার হাড় উঁকি মারছে, চিবুকের ডৌল বুঝি আর খুঁজলেও মেলে না। অমন মিষ্টি কোমল ফরসা রঙ জলে ধোয়া কাটা মাছের মতো কটকটে সাদা হয়ে গেছে। বিভা ভাবে আর উতলা হয়, তার চোখে জল আসে। বিভার দুটি ছেলেই ঘুমোচ্ছিল, ছোটোটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে রানী মৃদুস্বরে বলে, ওর কত বয়স হল ?

দু বছর।

দুটি ছেলেই রোগা, ছোটোটির পেট বড়ো, হাত পা কাঠির মতো সরু। ওটিকে দেখতে দেখতে রানী নিজের চেহারার কথা ভুলে গিয়েছিল। আচমকা সে বলে, কী আর করা যাবে, বেঁচেবর্তে যে আছি তাই ঢের। যা দিনকাল পড়েছে।

সত্যি ! শেষ করে দেবে।

বিভা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে ভুলে গিয়েছিল কী ভয়ংকর দুর্দিনের মধ্যে কী প্রাণান্তকর কষ্টে তারা বেঁচে আছে, ভুলে গিয়েছিল কী অবস্থায় কী খেয়ে কত দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক বুকে নিয়ে তারা দিন কাটায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে আর অস্পষ্ট অনুভব করে করে মনের মধ্যে যে বহস্যময় ভীতিকর একটা চোরাবালির স্তর গড়ে উঠেছে, যার অতল বিষাদ আর হতাশায় মিছে মায়ার মতো দুদিনের অর্থহীন লীলাখেলার মতো জীবন যৌবন তলিয়ে যায়, সেটা আজ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এই তবে জীবনের রীতিনীতি মানুষের বাঁধাধরা অদৃষ্ট যে এত তাড়াতাড়ি তারুণ্য আনন্দ উৎসাহ সব শেষ হয়ে যায় ? জীবনের এই চিরন্তন নিয়মেই সে আর বিভা জীবনটা শুরু করতে না করতে মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন হয়ে গেছে ? রানী তাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে, না, তা নয় ! জীবন অত ফাঁকিবাজ নয়, অমন ভঙ্গুর নয় দেহ। শুধু খেতে পরতে না পেয়ে, চিন্তায় ভাবনায় জর্জরিত হয়ে, হাসিখুশি আমোদ আহ্লাদের অভাবে তাদের এই দশা।

একা এসেছিস রানী ?

একা কেন ? ঘোড়ায় চেপেই এসেছি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে !

কী আশ্চর্য ! তুই কী বল তো ? এতক্ষণ বলতে নেই ?

অসহায়ভাবে বিভা পরনের কাপড়খানার দিকে তাকায়। রানী একখানা ভালো কাপড় পরে এসেছে, আগেকার দিনের সঞ্চিত তোরঙ্গে তোলা কাপড়ের একখানা, বিয়ে বাড়ির মতো বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া কেউ যা পরে না, পরলে মানায়ও না। এ রহস্যের মানে বিভা জানে, তারও একই অবস্থা। আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি যেতে, সিনেমা দেখতে বেড়াতে বার হতে সাধারণ রকম ভালো কাপড় যা মানায় তার তোরঙ্গেও আগেকার পাঁচ-সাতখানা ছিল, বাড়িতে পরে পরে সে ভান্ডার শেষ হয়েছে। এ দুঃশাসনের দেশে দ্রৌপদীদের কাপড় টানাটানির শেষ নেই।

বিয়ের সময়ের দামি শাড়ি আর ঘরে পরার শাড়ির মাঝামাঝি কিছু নেই, রাখা অসম্ভব। ঘরেও তো উলঙ্গ হয়ে থাকতে পারে না মেয়েমানুষ ? ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে চোখ কান বুজে সাধারণ সামাজিকতা রাখার জন্য সাধারণ রকম ভালো দু-একখানা কাপড় সে কিনেছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে এই প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার না করার কিন্তু সম্ভব হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টা দেহ ঢাকতে হয়, বাসি

কাপড় ছাড়তে হয়, স্নান করে ধুতে হয় সাবান কেচে ধোপে দিয়ে ধোয়াতে হয়—নিত্যকার এই চলতি প্রয়োজনের দাবি সবচেয়ে কঠোর। তাই ভাবতে হয়েছে, এখনকার মতো পরে ক-টা দিন চালিয়ে দিই, উপায় কী, ধোপ দিয়ে এনে তুলে রাখব। তুলে রেখেছে কিন্তু বেশি দিন তুলে রাখা যায়নি।

আলনার শাড়ি দুখানার একটি পরনের খানাব মতোই ছেঁড়া অন্যটি বড়ো বেশি ময়লা। বাক্সো কি খোলা যায় ? রানীর স্বামী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এখন কি অত সমারোহ কবা চলে ? হাত বাড়িয়ে সে ময়লা কাপড়খানাই টেনে নেয়।

কল্যাণী অমিয়কে জিজ্ঞাসা করছিল, কাকে চান ? কল্যাণী বিভার চেয়ে দশ বছরের বড়ো হবে, তার বেশি নয়। তার দুটি ছেলে মেয়ে, সংসারে এগারোজন লোক। সেই চাপে তার লজ্জা শরম মুষড়ে গেছে। আঁচিয়ে উঠে সদরে মানুষ দেখে এক কাপড়ে সে অনায়াসে তার প্রয়োজন জানতে এসেছে, তার সংকোচ নেই দ্বিধা নেই অস্বস্তি নেই। দাসীর মতো দেখায় না রানীর মতো দেখায়, বাইরের অজানা লোকের চোখে কেমন লজ্জাকর ঠেকে এ চিন্তার অঙ্কুরও বুঝি আর গজায় না তার মনে, এমন শক্ত অনুর্বর হয়ে গেছে তাব মধ্যবিত্তের অভিমান।

কিন্তু কী ভয়ানক কথা, নিজেও বিভা যে এগিয়ে এসেছে ব্লাউজ না গায়ে দিয়েই ! এটা তারও খেয়াল হযনি। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় বলে দশটা নাগাদ বাড়ির পুরুষরা আপিসে কাজে বেরিয়ে গেলেই সে ব্লাউজ খুলে ফেলে, বিকালে পুরুষদের ফেরার আগে একেবারে গা ধুয়ে আবার গায়ে দেয়। খালি গাযে থাকাটা কি তাবও অভ্যাস হয়ে গেল কল্যাণীর মতোই ? দাসী চাকরানি মজুরনির মতোই ? কান দুটি গবম হয়ে ওঠে বিভার।

আমাদেব এখানে এসেছেন, সে কল্যাণীকে বলে, সেই যে রানীর কথা বলেছি আপনাকে, আমার ছেলেবেলায় বন্ধু ? তাব স্বামী।

আপনাব অসুখ নাকি ? কল্যাণী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে।

অসুখে পড়েছিলাম, এখন সেরে উঠেছি।

কল্যাণী বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস কবে না, অমিয়র চেহারায় সেরে ওঠার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। কোনো রোগ সেরে গেলে এ রকম চেহারা হয় না মানুষের, বোগ বজায় থাকলেই হয়। কালিপড়া চোখে শুধু তার দৃষ্টিটা উজ্জ্বল ঝকঝকে।

ওঃ, মনে পড়েছে, কল্যাণী আচমকা বলে, আপনারই গুলি লেগেছিল।

কাগজে পড়ে বিভা বলেছিল আপনার কথা।

এত বড়ো কথাটা ভুলে যাবার জন্য কল্যাণী অপরাধীর মতো হাসে।

অসুখও হয়েছিল। অমিয় বলে।

দশ মিনিটের বেশি অমিয় বসে না। কাজে যাবার পথে সে রানীকে শুধু পৌঁছে দিতে এসেছে। বেচারির গুলিও লেগেছে, সরকারি দপ্তরের চাকরিটিও গেছে। বন্ধুরা একটি কাগজে মোটামুটি একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাগজটি আবার সরকার-বিরোধী, কাগজটাই কবে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নেই।

কিন্তু অমিযকে বিশেষ শঙ্কিত মনে হল না। বরং কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে।

কী জানেন, সব উনিশ আর বিশ, সে বিভাকে বলে, ও ছাতার চাকরি থেকেই বা কী এমন স্বর্গলাভ হচ্ছিল ? ঘরে বাইরে চাকরির মর্যাদা রাখতে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। নিজের মনটাও মানে না, যেমন হোক চাকরি তো করি, মাস গেলে মাইনে তো পাই যা হোক, একদম মিনিমাম ভদ্রলোকের স্ট্যান্ডার্ড তো অন্তত রাখতে হবে ? সে এক ছুঁচো গেলার অবস্থা, পেটও ভরতে পারি না, না খেয়ে মরতেও পারি না। এখন শালা বেশ আছি, হয় এসপার নয় ওসপার ; ব্যস !

অনায়াসে বিনা দ্বিধা সংকোচে সে বিভার সামনে শালা শব্দটা উচ্চারণ করে। সত্যই করে। কী ছোটোলোক হয়ে গেছে শিক্ষিত মার্জিত ভদ্র সন্তান ! পাশে কোথায় রেডিয়োতে মিষ্টি অলস সুরে গান বাজছে, উঠানে এঁটো বাসনের ঝনঝনানি। কল্যাণীদের বাসনের সঙ্গে দোতলার এঁটো বাসনও উঠোনে এসে জড়ো হচ্ছে। একসঙ্গে ছোটো ছেলেমেয়ে কাঁদছে তিনটে অথবা চারটে, সংখ্যাটা ঠিক ধরা যায় না।

উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় বলে, আপনার চিঠি পাবার পর থেকে বাড়ি বয়ে এসে ঝগড়া করার জন্য কোমর এঁটে বসেছিল, আমার অসুখের জন্য দেরি হয়ে গেল।

কীসের ঝগড়া ?

বলেনি ? চিঠিটা পড়ে কেবলি বলত, দেখলে ? ছেলেবেলার বন্ধু, কত ভাব ছিল, কাগজে গুলি লাগার খবর পড়ে একটা চিঠি লিখে দায় সেরেছে। কর্তাটিকে পাঠিয়েও তো খবর নিতে পারত ?

ওঃ, এই ঝগড়া !—বিভা সত্যই বিব্রত বোধ করে,—যাব মনে করেছিলাম। ওঁকে তাগিদ দিয়েছি, এক মাসের ওপর যাব যাব করছেন—

কিন্তু যেতে পারেননি।—কোটরে বসা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সোজা বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে দশ মিনিটে গড়া আশ্চর্য অন্তরঙ্গতায় মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমিয় সহজ সহানুভূতির সায় জানিয়ে বলে, আপিস, ছেলে পড়ানো, বাজার, রেশন কয়লা ওষুধ ডাক্তার--কী করেই বা পারবেন ?

এখনো ছুঁচো গেলার অবস্থা।—বিভা প্রাণ খুলে হাসে।

অমিয় চলে গেলে বিভা সহজভাবে বলে, নে কাপড়টা ছেড়ে হাত পা এলিয়ে বোস, সং সেজে থাকতে হবে না।

সত্য কথা বলতে কী, রানীকে এতক্ষণ সে প্রাণ খুলে গ্রহণ করতে পারেনি, ভিতরে একটা আবিষ্টভাব বজায় থেকে গিয়েছিল। খুশি হলেও সে আনন্দে খাদ ছিল। হোক সে ছেলেবেলার সখী, মাঝখানে অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে চারিদিকে ও তার নিজের জীবনে। কে বলতে পারে তাকে কী রকম দেখবে কল্পনা করে এসেছে রানী, তার কাছে কী রকম ব্যবহার আগে থেকে মনে মনে চেয়ে এসেছে ? হয়তো অনেক কিছু অন্য রকম দেখে তার ভালো লাগছে না--হয়তো সে ভুল বুঝছে তার কথা ও ব্যবহার, আরও হয়তো ভুল বুঝবে ! এই একখানা আর পাশের আধখানা নিয়ে দেড়খানা ঘরে কত দিকে যে বিষিয়ে গেছে জীবনটা সে নিজেই কি খানিক খানিক জানে না। রানী এসে দাঁড়ানো মাত্র তার ফ্যাকাশে ম্লান চেহারা দেখে উতলা হওয়ার সঙ্গে প্রাণটা তার ধক করে উঠেছিল বিপদের আশঙ্কায় ! তার সখী এসেছে, এককালে দিনে অন্তত একবার যাকে কাছে না পেলে সে অস্থির হয়ে পড়ত এতদিন পরে সেই সখী এসেছে তার ঘরের দরজায়—আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওকে তো সে অভ্যর্থনা করতে পারবে না, হেসে কেঁদে অনর্গল আবোল-তাবোল কথা যা মনে আসে বলে গিয়ে প্রমাণ দিতে পারবে না সে কৃতার্থ হয়েছে ! সে সাধ্য তার নেই, হাজার চেষ্টা করেও বেশিক্ষণ সে আনন্দোচ্ছ্বাস বজায় রাখতে পারবে না, ঝিমিয়ে মিইয়ে তাকে যেতেই হবে। কী ভাববে তখন রানী ? কী বিশ্রী অবস্থা সৃষ্টি হবে ?

আরও ভেবেছিল : বিকাল পর্যন্ত যদি থাকে, চায়ের সঙ্গে ওকে কী খেতে দেব ? ওর মেয়ে যদি দুধ খায়, দুধ কোথায় পাব ? শ্রান্তিতে যদি ওর হাই ওঠে, বিছানায় কী পেতে দিয়ে ওকে আমি শুতে দেব।

দশ মিনিটের মধ্যে অমিয় তাদের সখীত্বকে সহজ করে বাস্তবের দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। বিভার আর কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই, সংকোচও নেই। কারণ, কোনো অভাব

কোনো অব্যবস্থার জন্য রানী তাকে দায়ি করবে না, তার মেয়ে দুধের খিদেয় কাঁদলে সে যদি শুকনো দুটি মুড়ি শুধু তাকে খেতে দেয়, তাতেও নয়। চাদরের বদলে ময়লা ন্যাকড়া পেতে দিলেও গা এলিয়ে রানী তাকে গাল দেবে না মনে মনে।

এটুকু অমিয় তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

ময়লা শাড়িখানা পরে রানীও যেন বাঁচে।

একটা পান দে না বিভা ?

কোথা পাব পান ? ত্যাগ করেছি। মাসে তিন চারটাকা খরচ—কী হয় পান খেয়ে ? একটি লবঙ্গ মুখে দিয়ে মুখশুদ্ধি হয়। নে। বিভার বাড়ানো হাতে প্লাসটিকের চুড়ি নজর করে রানী হাসে। তুইও ধরেছিস ? ভাগ্যে এ ফ্যাশনটা চালু হয়েছে—সোনা না দেখে লোকে কিছু ভাবে না।

ফ্যাশন কি এমনি চালু হয় ? যেমন অবস্থা তেমন ফ্যাশন। সোনা নেই তোর ?

টুকটাক আছে। তোর ?

চারগাছা চুড়ি, সরু হারটা আর কানপাশা। সে বছর টাইফয়েডের এক পালা গেল, তারপর আমার কপাল টানল হাসপাতালে। মরবে জেনেও কেন যে পেটে আসে বুঝি না ভাই। আমাকেও প্রায় মেরেছিল, কী যে কষ্ট পেলাম এবার। অথচ দ্যাখ, এ দুটোর বেলা ভালো করে টেরও পাইনি। দিন কাল খারাপ পড়লে কি মানুষের বিয়োনোর কষ্টও বাড়ে ?

বাড়ে ... খেতে পাবে না, মনে শান্তি থাকবে না, গায়ে পুষ্টি হবে না, বিয়োলেই হল ?

দুই সখী অদ্ভুত এক জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চোখে চোখে তাকায়, দুজনের মনে এক সঙ্গে একই অভিজ্ঞতা একই সমস্যা জেগেছে, আজ দুজনের নিরিবিলি দুপুরে কাছাকাছি আসার সুযোগে পরস্পরের কাছে প্রশ্নটা তাদের যাচাই করে নিতেই হবে। জানতে হবে, খাপছাড়া অদ্ভুত একটা ফাঁদে পড়ার যে রহস্যময় ব্যাপারটা নিয়ে যন্ত্রণার অন্ত নেই, সেটা শুধু একজনের বেলাই ঘটেছে না দুজনেরই সমান অবস্থা। বুঝতে হবে কেন এমন হয়, এমন অঘটনের মানে কী ?

রানী বলে, বল না ? তুই আগে বল।

আগেও ঠিক এমনি ভাবেই জীবনের গহন গভীর গোপন রহস্যের কথা উঠত, কেউ একজন মুখ খোলার আগে চোখ মুখের ভাবভঙ্গি দেখেই দুজনে টের পেত যে জগতের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা শুধু তাদের দুই সখীর প্রাণে কথা বলাবলি হবে।

বিভা বলে, কিছু বুঝতে পারি না ভাই। এ রকম যাচ্ছেতাই শরীর, কী যে খারাপ লাগে বলার নয়, তবু আমার যেন বেশি করে ভূত চেপেছে। বিয়ের পর দু-একবছর সবারই পাগলামি আসে, ও বাবা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তখন রীতিমতো সংযমী ছিলাম বলা চলে। আগে ভাবতাম ও বেচারির দোষ, ঝগড়া করে ও ঘরের ঘুপটির মধ্যে বিছানা করে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তখন টের পেলাম কী বিপদ, আমারও দেখি মরণ নেই। ঘুম আসবে ছাই, উঠে এসে যদি ডাকে ভেবে কী ছটফটানি আমার। বিশ্বাস করবি ? থাকতে না পেরে শেষে নিজেই এলাম।

রানী একটু হাসে, উঠে এসে বললি তো একা শুতে ভয় করছে ?

তোরও তবে ওই রকম ?—বিভা যেন স্বস্তি পায়।

কী তবে ? তোর এক রকম আমার অন্য রকম ?

দুই সখী আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রানী বলে, তবে আমার আজকাল কেটে গেছে, অন্যদিকে মন দিতে হয়। তোরও কেটে যাবে।

একটু ভেবে রানী আবার বলে, আমার মনে হয় এ একটা ব্যারাম। ভালো খেতে না পেলে ভাবনায় চিন্তায় কাহিল হলে এ রকম হয়। ছেলেপিলেকে দেখিস না পেটের ব্যারাম হলে বেশি খাই খাই করে, চুরি করে যা তা খায় ?

চুরি করেও খাস না কি তুই ?

দুই সখী হেসে ওঠে।

সেই এক মুহূর্তের হাসির ক্ষীণ শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যায় শিশুর কান্না বাসন নাড়ার শব্দ মেশানো দুপুরের স্তব্ধতায়। শুধু শিশুর কান্না নয়, এ বাড়ির দোতলাতেই মেয়েলি গলায় একজন সুর করে কাঁদছে। উপবতলায একজন ভাড়াটে রমেশ, তাব বুড়ি মা। রমেশের ছোটো ভাই অশেষ, সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির ধান্ধায় ঘুরতে শুরু কবেছিল, কদিন আগে টিবি রোগে সে মারা গেছে।

এই সেদিন দেখেছি চলাফেরা করছে, বিভা হঠাৎ শিউরে উঠে বলে, দিনরাত ঘুবে বেড়াত। ওঁর সঙ্গে তর্ক করত আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কি না। এই বিছানায বসে একদিন রাত্রে কথা কইতে কইতে কাশতে শুরু করল, এক ঝলক রক্ত উঠে চাদরে পড়ল। কী বকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যে চেয়ে রইল ছেলেটা। আগে একটু আধটু রক্ত পড়েছে গ্রাহ্যও করেনি, সেদিন প্রথম বেশি পড়ল। নিজেব শরীরটাকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না, কী যে হয়েছে আজকালকার ছেলেরা---

আনমনে কী যেন ভাবে, একটু ম্লান হেসে বলে, প্রথমে ঠিক হযেছিল চাদরটা পুঁড়িয়ে ফেলব। কিন্তু তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চাদর কিনতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাই—

এ কথাটাও বিভা শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারে না, আবার আনমনা হয়ে যায়।

কী ভাবি জানিস রানী ? শুধু শাকপাতা আব পচা চালের দু মুঠো ভাত খায, না এক ফোঁটা দুধ না এক ফোঁটা মাছ। এই খেয়ে আপিস করা, রাত নটা পর্যন্ত ছেলে পডানো। একদিন যদি ওই রকম কথা কইতে কইতে ও কাশতে শুবু করে আর--

এ কথারও শেষটা মুখে উচ্চারণ করা অসম্ভব।

রানী অসম্ভবকে সম্ভব করে যোগ দেয়,—রক্তে বিছানা যদি লাল হয়ে যায় ? আমিও আগে এ রকম আবোল-তাবোল কত কী ভাবতাম। রক্তে একদিন রাস্তাই লাল হয়ে গেল। আর ভাবি না। কী আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করাব ? সংসারে কুলিমজুবও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।

নিচু চোখে দু আনা আর দু পয়সা

টিপি টিপি বৃষ্টিতে বস্তির হাঁটাপথের পাঁক কালো ক্ষীর হয়ে আছে। কী কী মেশাল আছে তালিকা বানানো শক্ত। লাগাও জমিটাতে বহুকাল গন্ডা তিনেক মহিষের বসবাস, এখান থেকেই উপকরণ এসেছে বেশির ভাগ। মাঝে মাঝে পিলু ধাঙর বন্ধ নালাটার নানারকম আবর্জনার জমাট বাঁধা মিতালি কোদালে টেনে তুলে নালার পাশেই জমা করে যায়, তাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। মানুষের দৈনিক স্বভাবগত ত্যাগও খানিক বয়ে গড়িয়ে পথে এসে যায়, কী করা যাবে কোনো প্রতিকার নেই। মরা ইঁদুর, বেড়ালছানা, পাখি, ব্যাঙ, ইত্যাদি পচে গলে মিশে যায়। আরও অনেক কিছুর সমন্বয় ঘটে। নিচু আকাশে ঘন কালো মেঘ থেকে যে নির্মল ধারা নামে টিন ও খোলার চাল বেয়ে গড়িয়েও ছলছলে পরিষ্কার থাকে, কী বিষাক্ত নোংরা হয়ে যায় এখানকার পৃথিবীতে পড়া মাত্র।

চালার কোনার দিকের মোটা ধারাটা সুখলালের ঘরের জানালার হাত দেড়েক তফাতে নামে, বৃষ্টি যখন জোরে হয়। সুখলাল ওখানে দুখানা ইট বসিয়ে দিয়েছে, নইলে জলের তোড়ে মাটিতে গর্ত হয়ে যাবে। টিপি টিপি বর্ষার ধারাটা এখন খুব সরু, ইট ঘেঁষা কটকটে ব্যাঙটা তারই ছিটকানো জলের ছাটে বিরক্ত হচ্ছে। বুড়ো আব্দুলের বড়ো মোরগটা আবর্জনার স্তূপে নির্বাহ নিস্পৃহের মতো ঠোকর মারছিল, আচমকা সে মাথা উঁচু করে উদ্ধত বীরের মতো দাঁড়ায়, ফুলে ফেঁপে ওঠে খানিক, মুরগি ক টা সচকিত হয়ে ওঠে।

মোরগটার দাম চার টাকা। সুখলাল মুরগি খায় না, মাছ মাংস ছোঁয় না। রাম রাম, ভাবাও যায় না ও সব খাওয়ার কথা। তার বাবুর জন্য মোরগটা সে দর করে রেখেছে। শকুন্তলা ওয়ার্কসের ইঞ্জিনিয়ার বীরেনবাবু তার বাবু। বাড়ি বেশি দূরে নয়, ও বেলা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। শনিবার বাইরে মদ বন্ধ, বীরেনবাবু সেদিন বাড়িতেই খায়। তার বউ মুরগির মাংস রাঁধবে। চার টাকা দাম মোরগটার। গা জ্বালা করে সুখলালের। শালা মুরগিখোর।

গোরবার মা এসে শুধোয়, হাঁ সুখলাল লক্ষ্মী বুপেয়া রেখে যায়নি ?

সুখলাল জিজ্ঞাসা করে, কীসের বুপেয়া ?

গোরবার মা বলে, একটা বুপেয়া দেবে বলছিল।

কী জন্য বলেছিল ? কীসে লাগবে বুপেয়া ?

পেটে লাগবে বুপেয়া, খেতে লাগবে। দু হাতে গোরবার মা চামড়া কুঁচকানো সরু পেটটা খাবড়ে দেয়—ধার দেবে বলেছিল।

আমি কিছু জানি না।

গোরবার মা ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়। লক্ষ্মী টাকা রেখে যাক বা না যাক, সুখলাল কিছু জানুক বা না জানুক, আসল কথাটা এই যে টাকা ধার দেওয়া হবে না। অন্য অবস্থায় লক্ষ্মী টাকা রেখে না গেলেও সুখলাল নিজেই দিত, কিন্তু অবস্থা এখন অন্যরকম। এক মাসের ওপর গোরবা ধর্মঘট করে বসে আছে।

গোরবার মা ভেংচে বলে, আমি কিছু জানি না ! জানো না তো অত কথা কেন, কীসের বুপেয়া, কী জন্য বুপেয়া—তোমার মুন্ডুর জন্য বুপেয়া।

দু মিনিটের মধ্যে সে ঘর থেকে কাঁসার ছোটো গেলাসটা নিয়ে ফিরে আসে। বলে, নাও, এবার বার করো টাকা।

একটা কার্ডের রেশন আনা বাকি আছে, এ বেলা না আনলেও উপায় নেই। শনিবার বিকালে রেশন দেয় না, রবিবার দোকান বন্ধ। আটা চাল আনাই চাই এ বেলা।

এ জ্বালা পেটের জ্বালার চেয়ে বেশি, কারণ পেটের জ্বালাতেই এর জন্ম। ময়লা ন্যাতানো এক টাকার নোটটা হাতে পেয়েই গোবরার মা তাই একটা শাপ ঝেড়ে দেয়, সুখলালের একটা টাকাও অন্তত সুদে ধার দেবার ক্ষমতা থাকায় তাকে ভয় করে বলে শাপটা সোজাসুজি গাল হয়ে বেরোয় না তার মুখ থেকে। শিল্পী কবির কায়দা খাটিয়ে ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, সিঁথেয় অত যে সিঁদুর সাঁটে তোমার লক্ষ্মী, তেলে জবজবিয়ে, ওতে উকুন লাগবে, পোকা ধরবে সুখলাল। এত তোমার টাকার খাঁকতি, টাকার পোকা নোংরা করবে সিন্দুর !

নোংরা কীসের ? আসলি চিনা সিন্দুর আছে। তোমার ছেলের বউ ভি ওই সিঁদুর লাগায়। আচ্ছা সিন্দুর।

গোবরার বউ দুর্গাকে সিঁদুরের গল্পটা সে শোনায় রেশন নিয়ে এসে। ইতিমধ্যেই হৃদয় পুড়ে যাওয়া জ্বালার সেই পুরাণ ইতিহাস কথকতার ছোঁয়াচ লাগা উদ্দীপনার মুহূর্তে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে যা বলেছিল আর সুখলাল যে জবাব দিয়েছিল তা অনেকখানি ধাঁধার মতো হয়ে গেছে। লক্ষ্মীর নামে যে অকথা কুকথা কানাঘুষা শোনা যায় তাই নিয়ে সে কি গাল দিয়েছিল সুখলালকে ? সুখলাল কী জবাব দিয়েছিল যে তার ছেলের বউ দুর্গাও বজ্জাতিতে কম যায় না ? কে জানে। ও রকম ঘষেমেজে সাবধানে শাপ দিতে গেলে না হয় জিভের সুখ, না হয় প্রাণের শান্তি। যা মুখে আসে বলে দিলে হয়তো সুখলাল চটে লাল হয়ে যেত, এ বস্তিতে বাস উঠত তাদের। তবু বোঝা তো যেত সঠিকভাবে যে একজনকে প্রাণ ভরে গাল দিলাম আর সে প্রাণভরে প্রতিশোধ নিল !

দুর্গার এক ফোঁটা কৃতজ্ঞতা নেই ! বুড়ি শাউড়ি যে জোগাড়যন্ত্র করে রেশনের চাল আটা এনে আজ শনি আর কাল রবিবারের পেটপূজার ব্যবস্থা করেছেন যেমন করেই হোক, নইলে এ বেলা থেকেই উপোস শুরু হত, এ সব যেন দুর্গার হিসাবে আসে না।

সে বলে, একবার গেছলাম, ফের যেতাম। তোমায় এত কাণ্ড করতে কে বলেছে ? ছেলে তোমায় কালীঘাটের ধর্মের ঘট ফেলে ধর্মঘটের ঘট মেনেছে। তা বাবা যা করেছে, সে আর দশটা মদ্দপুরুষের সাথে করেছে। বুড়িঘাগি মেয়েমানুষ তুমি, সব তাতে তোমার মাথা গলানো কেন ?

আ মরণ, গোবরার মা ভড়কে গিয়ে বলে, রেশনের চাল আটা না আনলে পর—

বড়ো তুমি পেট চিনেছ ওনার মা !—দুর্গা বলে আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে, সগ্‌গে যাবে সে ভাবনা নাই, পেটের ভাবনায় মলে। আমি বলে কত করে মাইনের দু টাকা আগাম নিয়ে ঘরে এলাম যে রেশন আনব, উনি আগে ভাগে সুদে টাকা ধার করেছেন ! তর সয় না !

একটা অতি আধুনিক ছোটো সাইজের ধাতুর টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, টাকা দিয়ে মোর গেলাস নে এসো, যাও।

আর দু আনা ?

সে তুমি দেবে। অত তোমার বাড়াবাড়ি কেন ?

সুদের দু আনা অবশ্য দুর্গাই দেয়। মুখে যা বলার তা যত খুশি বলা যেতে পারে কাজে মানিয়ে না চললে হবে কেন ? গোবরার মা তো কেবল নিজের পেট নয় তাদের সবার পেটের ভাবনাতেও উতলা হয়েছিল।

কয়েক মিনিট জোর বৃষ্টি হয়ে আবার টিপটিপ বর্ষণ চলে। মোটে একটা মাস, আষাঢ় মাসটা খেটেই যেন মেঘেরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ভোরে এমনই এক পশলা জোরালো বর্ষণের মধ্যেই লক্ষ্মী বস্তা মাথায় চাপিয়ে কাজে বেরিয়েছিল। সুখলালের একটা ছাতি আছে কিন্তু মেয়েরা কি ছাতি মাথায়

দেয় ? দিলে একটা ছাতি নিয়ে টানাটানিতে পুরুষের বড়ো অসুবিধা ঘটে। আগে লক্ষ্মী তিন বাড়িতে ঠিকে হিসাবে ঝিয়ের কাজ করত, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জলতোলার কাজ। এখন সে শুধু এক বাড়িতে ভোর থেকে প্রথম রাত্রি পর্যন্ত খাটে, বাসনমাজা জলতোলার কাজ ছাড়াও ছেলে রাখে, দুপুরে ওখানেই খায়, রাত্রের খাবার বাড়ি নিয়ে আসে। সিনেমা জগতের এক মস্ত লোকের বাড়ি, গিন্নির বড়ো বড়ো দুটি এবং একেবারে কচি দুটি বাচ্চা। দুটি জোড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় বারো বছরের তফাত। লক্ষ্মীর কাছে বস্তির সমস্ত মেয়ে পুরুষ এক আশ্চর্য কাহিনি শুনেছে এবং হেসেছে। কীসে এমন হয়, কোন রোগে, তারা জানে। দীর্ঘ যুদ্ধটা তাদের জানিয়ে দিয়ে গেছে। ওই যে মনোহর হেয়ার কাটিং সেলুনে চুল ছাঁটে, ওর বউ কাদম্বিনী বছর বছর চার পাঁচটা বিইয়ে আচমকা থেমে গেল খট করে—সাত-আটবছর। কোথায় ছিল তার ভগ্নীপতি দাশরথি, যুদ্ধের হট্টগোলের বাজারে এ কাজ ছেড়ে ও কাজ ধরতে ধরতে কোথা থেকে এসে জুটল এখানে, জোর করে ধরে বেঁধে চিকিৎসা করিয়ে দিল দুজনের। তারপর চেয়ে দ্যাখো ম্যাজিক, তিন বছরে ফের আবার দু-নম্বর বাচ্চাটা মাই টানছে কাদম্বিনীর। এত সব ঝঞ্ঝাট ছিল না জগতে, সায়েব রাজা মালিক বড়োলোকেরা তৈরি করেছে। নাচে গায় ফুর্তি করে, মেয়েপুরুষে বাছবিচার নেই কে কার সোয়ামি। শুধু তাই হলে তবু পদে ছিল। রক্তের সম্পর্কের বালাই পর্যন্ত নেই ওদের। বাপ মেয়ের হাত ধরে হাওয়া খেতে যায়, গভীর রাতে ভাইবোন ছাতের আলশেয় ঘেঁষাঘেঁষি ঝুঁকে ফিসফাস গুজগাজ করে। ঘরে বাইরে বল আর [illegible] পরের মধ্যেই বল, ওদের যে কোনো নিয়মনীতি ধর্ম নেই এ তো তারা চিরকাল টের পেয়ে এসেছে। আরও বেশি টের পেয়েছে মাঝে মাঝে সিনেমায় ওদের জীবনযাত্রার মারপ্যাঁচ দেখে—মেয়েবা যা সব দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, পুরুষেরা শিস দেয়, কী অনায়াসে ওরা নিজেদের সে সব কুৎসিত বেলেল্লাপানা দেখিয়ে দেয় !

বুড়ো বিনোদ বলে, তা যাই বলো, একধার থেকে পাপ করে যেমন ছিষ্টিছাড়া রোগ ছিষ্টি করে তেমনই আবার চটপট সেরে যাবার চিকিচ্ছেও বার করে খুঁজে।

তা করে, ধনদৌলত বিদ্যাবুদ্ধি কিছুর অভাব নেই, বিপদ যেমন টেনে আনে তেমনই তার কাটানও জানে। কিন্তু কেন ? এ কোন দেশি ছিনিমিনি খেলা সৃষ্টির সাধাসিধে সহজ নিয়ম নিয়ে ? কোন ভূতে ওদের কিলোয় যে মানুষ হয়ে পশুর মতো আচরণ না করে স্বস্তি পায় না ?

অনাদি বলে, টাকার গরম, খেমতার গরম।

বিপিন বলে, হাঁ, গরম বটে। নয় তো এত জানে এত করে আর নিজেদের স্বভাবটা শুধরাতে পারে না ? আপসে কটা নিয়ম করে আপসে মেনে চলতে পারে না ? তা, সবাই হল হামবড়া, কে বা কার কথা শোনে, কে বা কাকে মেনে চলে।

কাহিনি থেকেই কাহিনি আসে, লক্ষ্মী তার মনিব বাড়ির পারিবারিক কাহিনি আজ বলেনি, কাকডাকা ভোরে সে কাজে গেছে, এখানে হাজিরও নেই। কিন্তু গোবরার মার একটা টাকা ধার করা আর তাই নিয়ে দুর্গার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি এবং গোবরার মার আঠারো আনা দিয়ে গেলাসটা খালাস করে আনার ব্যাপারটা বাদলার এই সকালে ঘটেছে। তাতে জন্ম নিয়েছে নতুন এক কাহিনি, যার টানে গাঁটে গাঁটে গাঁটছড়া বাঁধা ইতিহাসের মতো অন্য কাহিনিগুলি বেরিয়ে এসেছে জটলার মধ্যে। ঘেঁষাঘেঁষি লাগালাগি সব চালা, একটা চালার নীচে খোপে খোপে ভাগ করা আস্তানায় প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে অনেকগুলি মানুষের বসবাস। বিশেষ ঘটনা ঘটলে, কাহিনির গাঁটছড়ায় নূতন একটা গাঁট পড়লে, ঢিল-লাগা চাকের মতো চাঞ্চল্য ও জটলার গুঞ্জন দেখা দেবে বইকী।

লক্ষ্মী বা সুখলালের কাছে মাঝে মাঝে অনেকেই ওরকম দুটো একটা টাকা ধার নেয়, ঘটিবাটি বাঁধাও দেয় অবস্থা বিশেষে, আসল এবং সুদ দুইই আদায় করে সুখলাল। এ বস্তির ক্ষুদ্র এলাকায় কেন, প্রকাণ্ড পৃথিবীটায় সর্বত্র এটা নিত্যকার ঘটনা, মানুষের জীবনযাত্রার একটা সাধারণ মূল নিয়ম।

কীসে তবে সারা বস্তিটা চঞ্চল হল ? জগতের সমস্ত অনাচার অত্যাচার অনিয়মের অসংখ্য গুদামখানার যেটা অন্যতম, সেখানে যারা প্রায় উলঙ্গ হয়ে উপোস দিয়ে পর্যন্ত থাকে, সুখলালের ব্যবহারে কী এমন গুরুতর অন্যায়টা তাদের টনক নড়িয়ে দিল ?

সুদের ওই দু আনা পয়সা।

ময়লা ন্যাতানো একটা এক টাকার নোট দশ-বিশমিনিট পরে চকচকে নতুন একটা ধাতুর টাকা হয়ে ফিরে এলে সুখলাল কেন সেটা গ্রহণ করে গোবরার মার কাঁসার গেলাস ফিরিয়ে দেবে না ? একটা আনি একটা ডবল আর দুটো ফুটো তামার পয়সাও কেন সে জোর করে আদায় করবে গোবরার মার কাছ থেকে ? একটা দিনরাত্রি দূরে থাক, একটা বেলাও কাটেনি, কয়েক মিনিটের মধ্যে গোবরার মা টাকাটা ফেরত এনেছে। তার জন্যও সুদ ? দু আনা সুদ, নগদ ? সুদ নেবার অধিকার নিশ্চয় আছে সুখলালের। টাকায় দু আনা সুদ সে নিশ্চয় পাবে যেই টাকা ধাব নিক—বরাবর বিনা প্রতিবাদে সবাই তাকে তার প্রাপ্য সুদ দিয়ে এসেছে। গোবরার মাও আগে দু বার গোবরার হয়ে তার কাছে টাকা নিয়ে আসলের সঙ্গে পুরো সুদ মিটিয়ে টাকা শোধ দিয়েছে। কিন্তু এবাব সে সুদ দেবে কেন ? এতটুকু সময়ের মধ্যে সে যখন টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে, তার আবার সুদ কীসের ?

কেন ?—এ যুক্তি সুখলাল বুঝতে চায় না, মানতে চায় না,—টাকায় দু আনা দিবে। আজ না দিক, দশ রোজ বাদে দিক, এক মাহিনা তক্ দু আনা। আজ দিতে বলেছি আমি ?

বিনোদ মিস্ত্রি বলে, সুখলাল, ও হিসাব ছাড়ান দাও। মনে কর পাঁচ টাকার নোট নিয়ে এলাম তোমার কাছে। সুখলাল, ভাঙানি আছে ? তুমি বললে, না, ভাঙানি নাই। নোটটা রেখে একটা টাকা নিলাম তোমার কাছে, ফের খানিক পরে তোমার টাকা ফিরিয়ে দিলাম। সুদ নেবে তুমি ?

বিনোদের দীর্ঘ কাল্পনিক উপমার ব্যাখ্যা সকলে মন দিয়ে শোনে, কারণ তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের মর্মকথাটা সত্যই এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের কাছে। তুচ্ছ দু আনা পয়সাটাই যে আসল নয়, গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতির যে প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে সেটাই বড়ো কথা, মনে মনে পরিষ্কার বুঝলেও ভাষায় সেটা ব্যক্ত করতে তাদের সকলকেই রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছিল। সুখলাল তাদের সহজ ভাষায় কথা কইতে জানে, আসল বক্তব্য কী তাও বেশ বোঝে, কিন্তু এখন সে ওই ঘরোয়া ভাষা বুঝতেই নারাজ হয়েছে, তাই অবশ্য এত মুশকিল। কাটা ছেঁড়া ছাঁকা কথায় একেবারে ওই দু আনা সুদ থেকে নীতিটা ছেঁকে নিয়ে ভিন্ন করে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে গেলেই এতক্ষণ তাদের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যটা যেন হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল। সকলের মেজাজ তাই চড়ছিল, বিনোদ গোবরার মার কাঁসার গেলাসটার স্থানে কাল্পনিক একটা পাঁচ টাকার নোট আমদানি করে মূল কথাটা সুখলালের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে ভেবে তারা একটু ঠান্ডা হয়।

কিন্তু সুখলালেরও নিজের সাদাসিধে নীতিবোধ আছে, সে তার গোঁ ছাড়তে রাজি নয়। টাকা হাত বদল হলে সুদ নিয়ে ফিরবে এর মধ্যে তার কাছে আর কোনো জটিল হিসাব নেই।

পাঁচ রুপেয়ার নোট !—সে বলে, পাঁচ রুপেয়া নোটে এক রুপেয়া নিলে সেটাও হাওলাত আছে কি ? পাঁচ রুপেয়া নোট দিয়ে এক রুপেয়া নাও, চার রুপেয়া নাও, পুরা পাঁচ রুপেয়া নাও, আমার তাতে কী আছে ? রুপেয়া যদি ধার নিবে, তবে সুদ দিবে, বাস্।

এটা যুক্তি বইকী, আইনের অকাট্য যুক্তি। মুশকিলও হয়েছে ওইখানেই। উচিত অনুচিত ন্যায় অন্যায় মানবে না সুখলাল, সে শুধু আইন জানে !

মালতী বলে, মরণ তোমার। আর তুই কথা জানিস নে ? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা একশোবার !

মালতী তিন টাকা ধারে সুখলালের কাছে, মাস পুরতে আর মোটে কটা দিন বাকি। মাস পুরে দুটো দিন গেলেই তার ছ আনা সুদ ন আনা হয়ে যাবে।

বনমালী কটমট করে তাকিয়েছিল। দু বার মুখ খুলে নরম গরম অনেক কথা বলে ব্যর্থ হয়ে সে গুম খেয়ে গিয়েছিল। কারখানায় অ্যাকসিডেন্ট ঘটে সে তিন হপ্তার ওপর বসে আছে, এখনও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ঘটি বাটি তার বউও বাঁধা দিতে শুরু করেছে, তবে সুখলালের কাছে নয়। সুখলালের প্রতি তার একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে। অন্য কোনো কারণে নয়, সংগতি থাকতেও বউকে সুখলাল বাবুদের বাড়ি খাটতে দেয় বলে।

বনমালী হঠাৎ গর্জন করে ওঠে, এ সুদ তুমি পাবে না সুখলাল !

রাগে সে কাঁপছে বোঝা যায়। তবে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাতটাও চোখের সামনেই ছিল। সেদিকে চেয়ে সুখলাল ব্যঙ্গভরে বলে, কী জন্য পাব না ?

এই জন্য পাবে না।—বাঁ হাতে বনমালী তার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।—শালা দালাল !

সবাই চুপ করে থাকে, সুখলালও। এতক্ষণে তার চৈতন্য হয়েছে। বনমালীকে কেউ সমর্থন জানায় না কিন্তু প্রতিবাদও আসে না কারও কাছ থেকে। বনমালী যা ভালো বুঝেছে করেছে, কারও কিছু বলার নেই।

কিন্তু সুখলাল তার মানে জানে।

দু আনার জন্য এত কাণ্ড যাদের খাপছাড়া উদ্ভট মনে হবে, বানানো গল্পের মতো মনে হবে, সোজাসুজি তাদের কেউ বলতেও যায় না ব্যাপারটা। ঘটনাচক্রে দু-একজনের কানে যায়।

যেমন লোচন সা ব মুদি দোকানে বিনোদ যখন লোচনকে ঘটনার বিবরণ বলে, ধরণীবাবু বিপিনবাবু অবিনাশবাবুও তা শোনে। ধরণীবাবু উকিল, অন্য দুজন চাকুরে।

ধরণী উদাসভাবে বলে, ভেতরে আরও কত ব্যাপার আছে !

বিনোদ মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়, উৎসুক হয়ে এমনভাবে প্রশ্ন করে যেন ভেতরে আরও যে সব গোপনীয় ব্যাপার ধরণীর জানা আছে শুনতে না পেলে তার চলবেই না।—কী ব্যাপাব আছে বাবু ?

ধরণী ব্যঙ্গ টের পায়।—সে তোমরাই জানো ! ব্যাপার আছে নিশ্চয় নইলে—

বিপিন বলে, মেয়েছেলের ব্যাপার হতে পারে। নইলে দু গন্ডা পয়সার জন্য—

অবিনাশ বলে, ঝগড়া মারামারি তো লেগেই থাকে, একটা উপলক্ষ পেলেই হল। সকালবেলাই মদটদ খেয়ে হয় তো—

ওটা হল গিয়ে কী জানেন বাবু,—লোচনের হাসি শান্ত, স্বস্তিকর,—ওরকম হয়। মানুষের জিদ চেপে যায়, সেটাই আসল, পয়সাটা নয়। কিশোরীবাবু কাল আধসের মোটা দানা চিনি নিলেন, দাম সাড়ে আট আনা, একটা আধুলি দিলেন। আমি বললাম, আর দু পয়সা বাবু ? কেন, তোমায় সাড়ে আট আনা দিয়েছি। না বাবু একটা আধুলি দিয়েছেন, দু পয়সা দেননি। বাবু চটে উঠলেন, আমি বলছি সাড়ে আট আনা দিয়েছি, নিজে গুণে দিয়েছি, তবু তুমি না বলবে ? আমি বললাম, যাক গে বাবু, দুটো পয়সার ব্যাপার তো। শুনে সে কী রাগ কিশোরীবাবুর ! চটেমটে বললেন, তার মানে ? আমি মিছে কথা বলছি ? তোমায় ঠকাচ্ছি দু পয়সা ? আমি যত বলি, যাক না বাবু, আমারই ভুল হয়েছে, বাবু তত চটে যান ! বললেন, দাঁড়াও, তোমায় আমি হিসেব করে দেখাচ্ছি আমি মিছে কথা কই না। দশ টাকার নোট নিয়ে বেরিয়েছিলাম, খরচ মেলালে বেরিয়ে পড়বে তুমি মিথ্যেবাদী কি আমি মিথ্যেবাদী। চাকরের কাছ থেকে বাজারের থলি নিয়ে ঢাললেন, পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট আর কী সব টুকিটাকি জিনিস বার করলেন, ব্যাগ ঝেড়ে পয়সাকড়ি সামনে রাখলেন। তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে হিসেব মেলাতে লাগলেন। সকালবেলা খদ্দেরের ভিড় কত, কেনাবেচা সব বন্ধ

রইল !—লোচন মুখের স্থায়ী হাসিকে আরও ফলাও করে তোলে,—জিদ চাপলে দু-পয়সার জন্যেও অনেক কাণ্ড হয় বাবু !

তারপর কী হল লোচন ? কিশোরীবাবু কী করলেন ?

কিশোরীবাবু ? মুখ গোমড়া করে তিন-চারবার হিসাব মেলালেন, টাকা পয়সা গুণলেন। তারপর খানিক গুম খেয়ে থেকে হেসে বললেন, আমার ভুল হয়েছিল লোচন, দু পয়সা বেশি হচ্ছে ! এই নাও তোমার দু পয়সা।

একভাবে বেড়ে কমে বৃষ্টি চলেছে। জোরে বৃষ্টি নামায় দোকানে আটকে না গেলে বিনোদের কথাও ধরণীদের কানে যেত না, দাঁড়িয়ে লোচনের গল্প শোনারও সময় হত না। বৃষ্টি আবার ধরে আসায় যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ধরণী বলে, কিশোরীবাবু কিন্তু বললেন, তুমি নাকি খুব মেজাজ দেখিয়েছ, অভদ্র ব্যবহার করেছ। তুমি নাকি ওজনে কম দাও, খুঁজে পেতে সস্তা দরে খারাপ মাল আনো। তা যাই বলো, দোকানটা তোমার বড়ো নোংরা লোচন !

তারা তিনজন বিদায় হলে লোচন বিনোদকে এবং সাধারণভাবে উপস্থিত খদ্দেরকে উদ্দেশ করে বলে, শুনলে ? তাই আজ কিশোরীবাবু লক্ষ্মী ভান্ডার থেকে সওদা নিয়ে গেলেন, আমি ভাবি ব্যাপার কী ! নিজে ভুল করলেন, নিজে চটাচটি করলেন, এখন খদ্দের ভাঙাচ্ছেন ! দুটা পযসার জন্যে !

নিচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা

মেয়েটির নাম দুর্গা। নোটন মিস্ত্রির মেয়ে। নোটনেব আর একটি মেয়ে আছে, সেটি খুবই বাচ্চা, নোংরা স্যাঁতসেঁতে দাওয়ায় সবে হামা দিতে শিখেছে। মাঝে মাঝে গড়িয়ে আরও নোংরা ভেজা উঠানে পড়ে গিয়ে তারস্বরে চেঁচায়। ছেলেমেয়েদের উপর নোটনের ভালোবাসা কত সেটা বস্তির আর দশজনেরটা দিয়েই মাপা চলে, এদিকে আছে ওদিকে নেই, তলানি আছে ফেনা নেই, বস্তির নরম গরম ভোঁতা বাৎসল্য যেমন হয়। বয়সকালে দুর্গা একটু বেশি রকম তড়বড়িয়ে বেড়ে গিয়ে দশটা পুরুষের চোখে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠায় বাপের দায়িত্ব সম্পর্কে নোটনের চেতনাও তড়তড় করে বেড়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। বাস্তব স্নেহের যা চিরকালেব রীতি। ছোটো মেয়েটার দাওয়া থেকে উঠানে গড়িয়ে পড়া নিবারণ করা অসাধ্য না হলেও অতটা আর পেরে ওঠা যায় না, ওটুকু পড়লে মেযেটার ব্যথা পাওয়ার বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। অনেক চোট জীবনে সইতে হবেই, এখন থেকেই নয় শিক্ষা শুরু হল, শক্ত হবে। পড়ে গিয়ে মরে যাবাব বা অন্তত হাত পা মাথাটা ভাঙবার ভয় থাকলেও নোটন উদাসীন না থেকে প্রতিবিধানের একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয় করত। যেমন বড়ো হলেও দুর্গাব সম্পর্কে তারা সচেতন হয়েছে। দুর্গার বুক পিঠ মাজা থেকে সমস্ত শরীরটা অল্পদিনে বর্ষাকালের কলাগাছের মতো পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে ওঠায মাবাত্মক বিপদেব আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে গেল। বাপ হয়ে তখন মেয়ের দিকে নজর না দিয়ে সাবধান না হযে আর উপায় কী ?

বস্তিতে পাপপুণ্যের, আত্মরক্ষা আব ধ্বংস হওয়ার সীমানা বড়ো সংকীর্ণ। বড়ো অস্থায়ী বস্তির মেয়ের এই পরম লোভনীয় দৈহিক ও মানসিক অবস্থাটি, যৌবনের প্রথম জোযারে থইথই করা দেখতে দেখতে দুদিনে শেষ হয়ে ভাঁটার টানে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে, এমনই ভয়ানক সেখানে খেয়ে পরে বাঁচার লড়াই। বাবুদের মতো তো নয় যে সামলে সুমলে ডাক্তার দেখিয়ে টনিক খাইয়ে শুইয়ে বসিয়ে হাসি তামাশা খেলাধুলো সিনেমা থিয়েটারে মন ভুলিয়ে বিশ-ত্রিশবছর পর্যন্ত পুষে রাখা চলবে। বস্তির গরিব উপোসি ঘরে রূপ যৌবন স্রেফ প্রকৃতিব খেলা, শুধু একবার দুদিনের জন্য, কুমারী মেয়ের মা হবার জন্য খাঁটি সাজসরঞ্জাম, সেইখানেই খতম। তাবপর শুধু কপালের জের টানা। অরাজক লুটের রাজ্যে তাই জগতের সমস্ত লোভ, মালিকবাবুদের লোভ পর্যন্ত, বস্তির মেয়ের দামি দুদিনকে লুট করতে ওত পেতে থাকে।

মেয়েকে আড়াল করে বাঁচিয়ে চলতে কী না করেছে নোটন। দুর্গার মার জ্বর হয়েছিল, তাই মেয়েকে সে একা বাবুদের বাড়ি জল তুলতে বাসন মাজতে পাঠিয়েছিল বলে মেরে সে তার পিঠের চামড়া আস্ত রাখেনি। তাড়াতাড়ি বিনোদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে স্থির করে ফেলেছে। মেয়ের জন্য দুর্গাব মার কোনো ভাবনা নেই এমন নয়, কিন্তু তার মন মেজাজ ভোঁতা হয়ে গেছে। কোনো বিষয়েই তেমন উৎসাহ পায় না। মেয়েটা ভালো থাক সে তো ভালো কথাই। একটু আধটু নষ্ট হলে কী আর কবা যাবে ? একেবারে বিগড়ে খারাপ না হয়ে গেলেই হল। এমন করে আগলে রেখে কি স্বর্গ লাভ হবে ?

মেয়েটাকে বাঁচিয়ে চলার ঝোঁকে, এমন রত্ন তার কুঁড়েঘরে আছে এই গর্বে, কতগুলি দিকে নোটন প্রায় মানুষ হয়ে উঠেছিল। নেশা করে হইচই হল্লার স্বভাব প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, কাজের পর তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে মনটা ছটফট করত। দুর্গার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সে আবিষ্কার করেছে মেয়েটা তার দেখতেই শুধু ভালো নয়, তার স্বভাবটাও বড়ো ভালো।

বস্তির অনাবৃত জীবন। বাপ-মা সজাগ সতর্ক থেকে মেয়েকে পাহারা দিতে পারে কিন্তু চারিদিকের লোভকে আড়াল করার সাধ্য কারও নেই। সেটা অন্তর নামক স্থানেই সম্ভব। সেটাই হয়ে

দাঁড়ায় সবচেয়ে বিপদ। মেয়ে টের পায় চারিদিকে তার জন্য বিপুল কামনা উদ্যত হয়ে আছে,—দুঃখ দুর্দশা লাঞ্ছনা অবজ্ঞা সওয়া মেয়ে ! জগতে হঠাৎ নিজের দাম এমন অদ্ভুতরকম চড়ে যেতে দেখে তার মাথা বিগড়ে যায়, সে দিশে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু দুর্গা তেমন নয়, সে মাথা ঠিক রেখেছে, তার নিজের মধ্যেই সামলে চলার ঝোঁক আছে। চোখ তুলে সে তার ছোটো জাতটির দিকে তাকায়, অনুভব করে এইবার যে মস্ত একটা বোঝাপড়া করবে বলে চারিদিকে জগৎ উদগ্রীব হয়ে আছে। নিজেরও এই ভাবনায় একটা অদ্ভুত সুখকর অস্থিরতা বোধের মধ্যে তার খেয়াল রাখতে ভালো লাগে না। বোঝাপড়া করলে সেই করবে, সেই বোঝাপড়া করা না করার মালিক। নিজের উপর তার এই মালিকানা স্বত্বকেই তার বাপ সযত্নে রক্ষা করেছে।

দুর্গা প্রাণপণে খাটে, বাপের যত্ন করে। সুখলালের উগ্র দৃষ্টি আর নোট দেখানো ইঙ্গিত নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় উপেক্ষায় চেয়ে দেখে, বুড়ি মাতঙ্গিনীর মারফত কে তাকে রাজরানির মতো সুখে রাখতে পাগল হয়েছে তার কাহিনি শুনে নাক সিঁটকোয়, অন্যদের ভাব জমানোর আলগা চেষ্টায় মুচকে হাসে, সরে সরে যায়।

রেশনে পেট ভরে না, শাড়িতে গা ঢাকে না, কোনও একটা শখ মেটে না, খাবার জলটুকুর জন্য নিত্য মারামারি করে প্রাণ যায়, শ্যাওলায় পাঁকে পায়ের হাজা কামড়ায়, আলোহীন বদ্ধ বাতাসে সারা গায়ের ঘামাচি চুলকানি হয়ে দাঁড়ায় তবু বস্তির মেয়েটাব কাছে জীবন মিষ্টি মজাদার লাগে। বাপ কারখানায় খেটে আর মা বাবুদের বাড়ি বাসন মেজে দুটো পযসা ভিক্ষা পায়, তাতেই !

এরই মধ্যে একদিন কারখানায় মেশিনে জখম হয়ে নোটন তার ঘরের খাটিয়ায় দীর্ঘকালেব জন্য বিশ্রাম পায়। ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন কোম্পানি আমলেই আনে না, অকাট্য প্রমাণ খুঁজে বাব কবা হয় যে মাতাল অবস্থায় সম্পূর্ণ নিজের দোষে নোটন বিপদ ঘটিয়েছে, দুর্ঘটনাব জন্য অন্য কেউ দাযি নয়। তবু কোম্পানি দয়া করে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং কয়েকটা টাকার ব্যবস্থা করে দেয়। এই নিয়ে একটু গোলমাল হয় কিন্তু ঠিক ওই সময় বিরোধী একটা ইউনিয়ন গড়বার তোড়জোড় চলতে থাকায় সেই ডামাডোলে এটা চাপা পড়ে যায়।

ক-মাসে নোটন বিছানা ছেড়ে উঠবে, আবার কাজ পাবে, ঠিক নেই। শুধু দুর্গার মার ঝি-গিবির ভরসা। দু বাড়িতে সে ঠিকে কাজ করছিল, আর এক বাড়িতে কাজ নেয়—দুর্গা সাথে গিয়ে হাত লাগিয়ে কাজ খানিকটা এগিয়ে দিতে আসে। তবু শ্রান্তিতে হাত-পা প্রতিদিন ঝিমিয়ে আসে দুর্গার মার, এমনিতেই তার অবস্থা কাহিল হয়ে আসছে দিন দিন, আঁতুড়ে যাবার সময় ঘনিয়ে এল। আর কিছুদিন পরে কাজ করাই বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রথম বাড়িতে কাজ শুরু করেই দুর্গার মা তীব্র আক্রোশে চাপা গলায় ধমকাতে থাকে : হাত চালা হাত চালা, হারামজাদি ! খেয়ে খেয়ে হাতি হয়েছিস, হাত চলে না তোর ? বলে, খুচখুচ দুটো বাসন মেজে এক বালতি জল তুলে ঘর যাবার মন—বাপকে রেঁধে খাওয়াবেন।

দুর্গা আরও জোরে হাত চালিয়ে ঝেঁঝে বলে, আদ্দেকের বেশি কাজ করে দিই তোর ফের বলছিস ! তার চোখে জল আসে ! এক মুহূর্তের জন্য।

দু-একটাকা বেতন আগাম নিয়ে চাল আটা এনে কোনোমতে দিন চলে, দু-একদিন উপোস যায়। ঠিকে ঝিরা আজ আছে কাল নেই, বাবুরাও তাই হিসেব করে আগাম বেতন দেয়, কিছু পাওনা হাতে রেখে। নইলে হঠাৎ বিনা নোটিশে কাজ ছেড়ে দিলে বাড়ির মেয়েদের বাসন মাজতে হবে। পাঁচ-ছ তারিখের আগে গতমাসের পুরো বেতন শোধ করে না, বেতন পেয়ে হঠাৎ যদি কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়ি যায়, বাসন মাজতেই হয় বাড়ির মেয়েদের, পাঁচ-ছদিন এমনই খাটিয়ে নেওয়া গেছে ভেবে গায়ের জ্বালা অন্তত কিছুটা শোধ হবে ! গরিবের ওপর অগ্রিম প্রতিশোধ ব্যবস্থা।

নোটনের মুখ দাড়িগোঁফে ভরে গেছে, চোখ কোটরে ঢোকানো। জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে ঝিম ধরা সুরে বলে, এক বাড়িতে এক মাইনেতে দুজনার খাটার দরকার ? তুই দু বাড়ি কাজ নে দুর্গা।

মা তিন বাড়ি সারতে পারে একা ?

এক বাড়ি নে। মিত্রি বাবুর বাড়িতে নে, ওদের কাজ হালকা।

মিত্তির বাড়ি ? মা ও বাড়ি নেক, আমি মার একটা বাড়ি ধরব।

তারা দুজনেই জানে এটা কাজের কথা নয়, মিত্রদের বাড়ি দুর্গার মাকে রাখবে না, মিত্রবাবুর দরকার দুর্গাকে। নোটন একদিন দুর্গাকে একা কাজে পাঠানোর অপরাধে দুর্গার মার পিঠের চামড়া তুলে দিয়েছিল, আজ সে দুর্গাকে একা ওই মিত্রদের বাড়িই কাজ নিতে তাগিদ দিচ্ছে। পঙ্গু অসহায় অবস্থায় বিছানায় পড়ে থেকে উপোস দিয়ে সেরে উঠে কাজে যাবার আশা সফল হবার অনেক আগে অনাহারে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখে আর কোনো হিসাব কি মানুষের থাকে ?

জীবনটা তিতো লাগতে শুরু করে দিয়েছে, কারণ দিগন্তে দেখা দিয়েছে আতঙ্কের কালো মেঘ। নোটন পঙ্গু হয়ে পড়েছে বলে শুধু নয়, আজ বাদে কাল তার মা আঁতুড়ে ঢুকবে বলেও নয়। বস্তি বাড়ির মজুরের মেয়ে কি আর বাবুদের বাড়ির মেয়ের মতো বাপ ভাই একমাত্র ভরসা করে থাকে ? বড়ো হয়েও যে ওদের কিছু হলেই সর্বনাশ ঘটে যাবে, কূলকিনারা পাবে না। যা হত শুধু দুর্ভাবনার বিষয় তাই আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেছে বিনোদের কারখানায় ছাঁটাই আর ধর্মঘটের জন্য ! কী কপাল দুর্গার ! ঠিক এই সময়টাতেই বিনোদের কারখানায় হাঙ্গামা শুরু হল, দুদিন সবুর সইল না। ঠিক যখনটা সে শেষ ধাপে পৌঁছেছে, এদিক বা ওদিক তাকে ঝাঁপ দিতেই হবে।

বিনোদ একলা মানুষ, সে এই হাঙ্গামায় জড়িয়ে না পড়লে তার ভাবনা কী ছিল।

টুকিটাকি যে জিনিসগুলি বিনোদ তাকে গোপন উপহার দিয়েছে সেগুলি দুর্গা চুপিচুপি ঘাঁটাঘাঁটি করে। উনানে আগুন দিতে হয়নি সেদিন, ভাত রাঁধবার পাট নেই, শূন্য হাঁড়িতে শুধু জল ফুটলে কি ভাত হয় ? কী ছাই জিনিসগুলি চিরুনি, খোঁপার নকল ফুল, রঙিন কাঁচের চুমকি বসানো চুড়ি, পুঁতির মালা—এ সব দিয়ে কি পেট ভরবে মানুষের, পেটের আগুন মনের আগুন নেভে ? মা ঘরের কোণে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কোঁকাচ্ছে। নোটন থেকে থেকে গাল আর শাপ দিচ্ছে মা মেয়ে দুজনকেই—জোয়ান মাগিরা এতকাল তার ঘাড়ে খেয়ে হাতির মতো মুটিয়েছে, দুদিন দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারে না। বড়ো মোড়ের দোকানটায় বেডিয়ো বাজছে শোনা যায়। এদিকে কানের কাছাকাছি কে যেন তীক্ষ্ণসুরে প্রাণপণে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে।

মা কী বলেছিল দুর্গা শোনেনি, তার বাপ মা তুলে গাল দিতে নোটন আধ-শোয়া অবস্থায় হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে মাটির ভাঁড়টা ছুঁড়ে মারে। ভাঁড়টা ছিল দইয়ের, দুর্গার মা-ই তার এক মনিব বাড়ি থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। ভাঁড়টা নোটনের কফ থুতু ফেলার কাজে লাগছিল।

কচি মেয়েটার মাথা কেটে রক্তপাত করিয়ে ভাঁড়টা মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে যায়।

দুর্গার মা বলে, এত রাতে যাচ্ছিস কোথা শুনি ?

যাচ্ছি চুলোয়

নোটন আশান্বিত হয়ে বলে, যাক না যাক। যেতে দাও।

বিনোদও খাটিয়ায় শুয়ে অল্প অল্প কোঁকাচ্ছিল, কারখানার দরজায় পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেয়েছে। রাগে ক্ষোভে উত্তেজনায় দুর্গা তখন কাঁপছে, কারও কোঁকানি শোনার মতো অবস্থা তার ছিল না।

শুনছ ? আজ শেষ কথা বলো। এই দণ্ডে বলো।

কীসের শেষ কথা বিনোদ জানে। ক-দিন আগেও দুর্গার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে গেছে। সে নিঃশব্দে দুর্গার বিস্ফারিত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার শুকনো শীর্ণ মুখ আর আলুথালু বেশ দেখতে দেখতে নিজেকে বিনোদের বড়ো দুর্বল, অসহায় মনে হয়।

তুমি ধর্মঘট চাও, না মোকে চাও ?

আবার কী হল ?

হয়নি কিছু। শেষ কথা বলে দাও, আমি আমার পথ দেখি।

বিনোদ চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবে।

তোকে চাই দুর্গা।

তবে যাও সুখলালের ঠেয়ে, আপস করে এসো গে। টাকা নিয়ে খাবার কিনে আনো। আমি সারাদিন খাইনি, ভাইবোন খায়নি।

বিনোদ বলে, আচ্ছা তুই বাড়ি যা দুর্গা, খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

দুর্গা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে। এবার এতক্ষণে মানুষটা তার চোখে পড়েছে।

তোমার কী হয়েছে শুনি ?

বিনোদ তীব্র গলায় ঝেঁঝে ওঠে, কী হবে, পিটুনি দিয়েছে। যা তুই বাড়ি যা।

খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দুর্গা নরম গলায় শুধোয়, তুমি একা আপস করলে কী হবে ?

বিনোদ কথা কয় না। ঘরের কোনার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে।

তখন সেইখানে দাঁড়িয়ে দুর্গা আবার মনে মনে হিসাব করে। উলটে-পালটে বিবেচনা করে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা। ঘাড়টা তার একটু কাত হয়ে আসে ভাবনার দাপটে। ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়, কী আর এমন লাভ হবে এই লোকটাকে আর তার লড়াইটাকে ভেঙে দিয়ে ? কোন স্বার্থটা বজায় থাকবে তার ? তার চেয়ে কোনোরকমে সেই যদি চালিয়ে নিতে পারে কিছুদিন সেও রইল তার এই মানুষটাও রইল, তাদের ভবিষ্যৎটাও রইল।

আজ তবে বরং থাক। কাল এসে ফের বিবেচনা করা যাবে।

কী বল অ্যাঁ ?

আজ কী খাবি তোরা ?

চলে যাবে ! মা জোগাড়ে গেছে।

বিনোদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে দুর্গা সুখলালের আস্তানার দিকে এগোয়। যে সুখলাল কালও তাকে বড়ো বড়ো চোখে দেখেছে, নোট দেখিয়েছে। বাঁচতে হলে লড়াই না করে উপায় কী ?